বিশুদ্ধবাণী

নবম ভাগ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
সম্পাদিত

বিশুদ্ধবাণী

নবম ভাগ
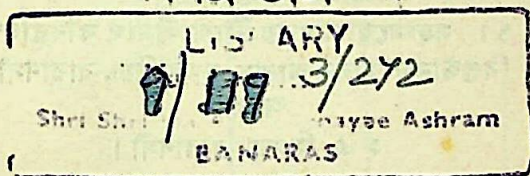
মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
এম, এ, ডি, লিট্, পদ্মবিভূষণ
সম্পাদিত

'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম
মালদহিয়া, বারাণসী।
সন ১৩৭৪ সাল

[মূল্য—আড়াই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়
৮৯, মহেশ মুখার্জ্জি ফিডার রোড,
বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬
ফোন—৫৬ - ২৭৬৩

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম, মালদহিয়া, বারাণসী।
অথবা
২ এ, সিগরা, বারাণসী।

২। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়,
৮৯, মহেশ মুখার্জ্জি ফিডার রোড,
বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬
ফোন—৫৬ - ২৭৬৩

৩। শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,
বিশুদ্ধ আশ্রম, বর্দ্ধমান।

৪। শ্রীশচীকান্ত রায়,
৪৫ সি ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা-১৬
ফোন—২৪—২৯২২

৫। শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
৪, অমিতা ঘোষ রোড, কলিকাতা-২৯
ফোন—৪৭—১১১৬

৬। মহেশ লাইব্রেরী,
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়,
কমলা প্রেস, গোধুলিয়া, বারাণসী।
ফোন— ৪২৭৩

—সূচী পত্র—

শ্রীশ্রীযোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

(আনুমানিক—১৯১৭ সনের)
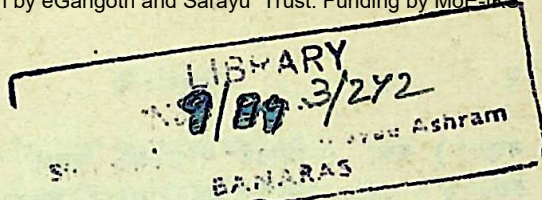
বিশুদ্ধবাণী

নবম ভাগ

দেবী-বন্দনা

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন. এম-এ

শৈলসুতে ত্বম্ অতীব দয়ার্দ্রা।
দুঃখ পয়োনিধি তারণ ভদ্রা।
অস্মি চিরায় কুবৃত্তিরধন্যঃ
কো নু শরণ্য ইহাঽস্ত মমান্যঃ ।।১।।

হে পর্ব্বত পুত্রি (দুর্গে), তুমি অত্যন্ত দয়ার্দ্রা, এবং দুঃখ-সাগর পার কর বলিয়া কল্যাণী। আমি চিরকাল কুবৃত্তি সম্পন্ন এবং সুকৃতিহীন! এ জগতে আমার শরণ্য আর কে হইবেন? ১।

শোণজপাঽনুকরোতি পদাভাং
শক্র শিরোমণি সংস্কৃত শোভাম্।
কুঞ্জর এতিতমাং গতিভঙ্গীং
রক্তকম্ ঈপ্সতি তেঽধরকান্তিম্ ।।২।।

রক্তজবা তোমার চরণের দীপ্তির অনুকরণ করে এবং ঐ দীপ্তি (তোমার চরণে প্রণত) দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হয়। (লোকে হস্তীর গতিভঙ্গীর প্রশংসা করে,

বস্তুতঃ) হস্তী তোমারই গতিভঙ্গী বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। আর বান্ধুলী ফুল তোমার অধরের বর্ণ পাইয়াও তাহার কান্তি আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়া সেই কান্তি কামনা করে। ২।

সিংহকটিং চরণাদৃত সংস্থাং
পীনপয়োধর-পায়িত বিশ্বাম্।
সোম সমাহিত শেখর ভূয়াং
নৌমি শিবাং সুখদাং জগদম্বাম্॥৩॥

(তুমি ক্ষীণ মধ্যা বলিয়া বলা যায়) তোমার কটি সিংহের কটি তুল্য (মনোরম)। (আর জগজ্জননী তুমি) তোমার পীন পয়োধর ছুইটির রস জগৎকে পান করাইয়া পরিপুষ্ট কর। চন্দ্র তোমার মুকুটের অলঙ্কার সমাধান করে। তুমি কল্যাণময়ী তুমি সুখদা। আমি তোমাকে স্তুতি করি। ৩।

সর্ব্ববিমোহন শক্তি সমেতা
সর্ব্বজনং পরিরক্ষসি মোহাৎ।
আযুধ ঘোরকরৈরতিভীমা
মন্দ মৃদুস্মিত বক্ত্র সুসৌম্যা।৪॥

(মহামায়া) তুমি সকলকে বিমোহিত করিবার শক্তি ধারণ কর, আবার তুমিই সকলকে মোহ হইতে পরিত্রাণ কর। তোমার দশ কর নানা অস্ত্রে সজ্জিত বলিয়া তুমি ভীষণ দর্শনা। আবার মন্দ মৃদুহাস্য সংবলিত তোমার বদন জানাইয়া দেয় তুমি সুসৌম্যা। ৪।

বিশ্বমিদং তব ভূতিবিলাসো
বিশ্বমতীত্য বিরাজসি চ ত্বম্।
কালকলাকলনেন কিলাঽস্মিন্
সংবিদধাসি সদা পরিণামম্।।৫।।

এই বিশ্ব তোমার বিভূতির বিলাসমাত্র। বিশ্বের বাহিরেও তুমি আছ। তুমিই কাল এবং তন্ত্রোক্ত কলার কলন (ব্যক্তী-করণ) দ্বারা সর্ব্বদা ইহাতে পরিণাম (রূপান্তর) সম্পাদন কর। ৫।

সিদ্ধি সমৃদ্ধি বিশেষ বিধানৈ-
রাদ্রিয়সেঽম্ব সুতাম্ কৃতপুণ্যান্।
পঙ্ককলঙ্কিত সূনু রুতার্ত্ত-
স্ত্বৎস্মরণাৎ পরিশুধ্যতি সদ্যঃ ।।৬।।

বিশেষ বিশেষ সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি বিধান দ্বারা মা, তুমি তোমার কৃতপুণ্য সন্তানগণকে আদর কর। আর যে সন্তান কলঙ্ক (পাপ) যুক্ত হইয়াও আর্ত্ত ভাবে তোমাকে স্মরণ করে সেও সদ্যঃ শুদ্ধি প্রাপ্ত (অতএব আদৃত) হয়। ৬।

কর্ম্মফলং হি তবৈব করস্থং
যচ্ছসি তৎ করুণাপরিধৌতম্।
সহ্যতরো ভবতীতি বিপাকো
রোধতি চেৎ করুণাং তব লোকঃ ।।৭।

মা, লোকের কর্ম্মফল তোমারই করস্থ। (দিবার সময়) তুমি তাহা তোমারি করুণা ধারা ধৌত করিয়া দান কর। সেই

জন্য কর্ম্মের কুফলও সহ্যতর হয়, যদি লোকে বুঝিতে পারে উহা তোমার কৃপাই। ৭।

দেবি দয়াং কুরু ময্যতিদীনে
মাহত্র বিচারয় পুণ্যম্ উদাঘম্।
স্পর্শবিলগ্নম্ অথায়স ভাণ্ডং
হেম ভবেদ্ অমলং সমলং বা ॥৮॥

দেবি, আমি অতি দীন; আমাকে তুমি দয়া কর। এস্থলে পুণ্য বা পাপের বিচার করিও না। নির্ম্মল হউক বা মলযুক্তই হউক লৌহভাণ্ড পরশ পাথরে সংলগ্ন হইলে স্বর্ণময় হইবেই। ৮।

সন্তত পাতক তাপ পরীতং
শান্তিকণং নহি বিন্দতি চিত্তম্।
খণ্ডয় দুর্ভর দুষ্কৃত রাশিং
মণ্ডয় নাম তবাঘবিনাশি ॥৯॥

সর্ব্বদা পাপ তাপে বেষ্টিত আমার চিত্ত কণামাত্র শান্তিও লাভ করিতে পারে না। তুমি (আমার) দুর্ভর দুষ্কৃতিরাশি খণ্ডন কর, এবং ঐরূপে তোমার পাপ বিনাশন নামেরও মণ্ডন কর। ৯।

জগাই মাধাই উদ্ধার

শ্রীকালীনাথ সরকার

(১)

দেখতে দেখতে "বিশুদ্ধবাণী"র অষ্টম ভাগও প্রকাশ হয়ে গেল। কত পরিচিত কত অপরিচিত শিষ্য ভক্তের শ্রীশ্রীগুরুদেবকে কেন্দ্র করে কত রকমের অভিজ্ঞতা, কত জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব কথার আলোচনা, এই আট ভাগে প্রকাশ হল, তা খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়েছি। প্রতি খণ্ড শেষ হয় আর মনে করি এবার আমিও কিছু লিখব। কিন্তু তার পরেই যখন মনে পড়ে যায় যে "বিশুদ্ধবাণী"তে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, কবিরত্ন অক্ষয় দত্তগুপ্তের মত মহা মহা পণ্ডিতদের লেখা বার হয়, তখন ভয়েও সঙ্কোচে হাত কুঁকড়ে যায়, কলম ধরা আর হয়ে উঠে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকল রকম বাধা দূর করে এবার সত্যই কিছু লিখতে বসেছি। তত্ত্ব কথা নয়, শাস্ত্র আলোচনা নয়, নিছক গল্প। জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলেই গল্প শুনতে এবং পড়তে ভালবাসেন।

(২)

যুগে যুগে কত যুগাবতারের আবির্ভাব হয়েছে। কত পাপী, তাপী, অজ্ঞান, মূর্খ তাঁদের কৃপা লাভ করে শাপমুক্ত হয়েছে, শান্তি পেয়েছে, জ্ঞান লাভ করে মহাজ্ঞানীতে পরিণত হয়েছে।

এ সবের বিবরণ কত শাস্ত্রে পুরাণে, কত প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থে প্রচার হয়েছে তা অনেকেই শুনেছেন, অনেকেই পড়েছেন।

কিন্তু এ যুগেও যে তেমনি একজন দেবতাকে মানুষের দেহ ধ'রে, মানুষের মধ্যেই বাস ক'রে, তাদের সুখ দুঃখের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রেখে কেবল পাপী তাপীদের উদ্ধারের জন্যেই জন্ম নিতে হয়েছিল তাঁরই কথা বলবো।

যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবকে যে এক জোড়া 'জগাই মাধাই' উদ্ধারের জন্যই সংসারে আসতে হয়েছিল তারই গল্প বলব। উচ্ছ্বাস নয়, অতিশয়োক্তি নয়, যা খাঁটি সত্য তাই বলছি।

(৩)

বাল্যকালে ধর্ম্ম টর্ম্ম বড় মানতাম না। আমিও না, শচীনও নয়—শচীন অর্থাৎ পরলোকগত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, আমার ভগিনীপতি ও গুরুভ্রাতা। সে পুরীতে থাকত, সরকারী কনট্রাক্টরী করত। সে ছিল ছোট বোনের স্বামী, কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু। রতনেই রতন চেনে।

দু এক মাস অন্তর ছুটী পেলেই পুরী যেতাম, দু পাঁচ দিন হৈ হুল্লোড় করে, নানা রকম আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরতাম। যাকে বলে ম্লেচ্ছাচারী, ঘোর অনাচারী, সব কিছুই। দুজনেই সমান। শচীনও কলকাতায় মধ্যে মধ্যে এসে জুটত। দুজনে মিলে থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখে হোটেলে খেয়ে ঘুরে বেড়াতাম। তখনকার দিনে আমরা

কলকাতার সব হোটেল, বায়োস্কোপ ও থিয়েটারের ভাল মন্দের মস্ত বিচারক ছিলাম। University Institute এ আড্ডা দিতাম, সখের থিয়েটারও করতাম। একবার পরলোকগত শিশির ভাতুড়ী মহাশয়ের সঙ্গেও Institute এর থিয়েটারেও নেমেছিলাম। ভুলেও কখনও কোন ধর্ম্ম আলোচনায়, তত্ত্ব আলোচনায় যোগ দিতাম না। তবে, মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম-মন্দিরে যেতাম, সে কেবল গান শুনতে, উপাসনা আরম্ভ হলেই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসতাম। ও সময় ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ঐ পর্য্যন্ত। তবে, হ্যাঁ এইখানে আমার ছেলেবেলার একটা গল্প বললে বোধ হয় ভালই লাগবে, কেননা এর সঙ্গে তুজন স্বনামধন্য লোকের নাম জড়িত আছে। তখন বোধ হয় আমার বয়স চৌদ্দ পনের হবে। বাড়ীর কাছেই 'কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়' এবং 'গ্রীয়ার পার্ক', এখন যেটা মহিলা উদ্যান হয়েছে। Deaf and Dumb স্কুলেই আমাদের খেলাধূলার আস্তানা। খেলার সাথী, স্কুলের বোবা কালা ছাত্র, স্কুলের শিক্ষকদের ছেলেরা এবং ঐ পাড়ারই জন কয়েক ছেলে। স্কুলের পাশেই গড়পার রোড, সেখানে স্বর্গীয় ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয় (বোধহয় পূজাপাদ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য) থাকেন। তাঁর ছেলে মুকুন্দলাল ঘোষ ও আমাদের একজন খেলার সাথী। মুকুন্দলাল ঘোষ পরবর্ত্তী কালে আমেরিকা প্রবাসী বিখ্যাত শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ গিরি নামে পরিচিত, যোগাছা সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর বহু আমেরিকাবাসী শিষ্য অনেক শিষ্যা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিরাট আশ্রম এখনও

আমেরিকায় পরিচালিত হচ্ছে। অনেক পূর্ব্বে যোগানন্দ যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর কলকাতার বাড়ীতে এক ভোজের আয়োজন হয় এবং এলবার্ট হলে এক বক্তৃতার আয়োজনে আমার নিমন্ত্রণ হয়। কথায় কথায় যোগানন্দ যখন শুনলেন যে আমি দীক্ষা নিয়েছি এবং কার কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তখন তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। অর্থাৎ ভাবটা যেন, যে তোমার মত নাস্তিকও শেষ পর্য্যন্ত ডুবলো। শুনলাম যোগানন্দ গুরুদেবের কাছে একবার এসেছিলেন। যোগানন্দের এলবার্ট হলের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। যোগ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি তাঁর যোগ-শক্তির পরিচয়ও একটু দিয়েছিলেন। তিনি সকলকে নিজের দু'হাত জোড় করে আঙ্গুলের ফাঁকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে জোর করে চেপে ধরতে বললেন এবং বললেন যে তিনি না বললে কেউই হাত খুলতে পারবেন না। অনেকেই করলেন এবং আমিও করেছিলাম। দেখলাম যে অনেকেই হাত খুলতে পারছেন না, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ত হাত খুলতে গিয়ে চেয়ার থেকে পড়েই গেলেন। কিন্তু কেন জানি না আমি সহজেই হাত খুলে নিতে পেরেছিলাম। এই হল বাল্য সাথীদের একজন। আর একজন হলেন মূক বধির বিদ্যালয়ের তখনকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, স্বর্গীয় মোহিনীমোহন মজুমদারের পুত্র মনোমোহন মজুমদার, অধুনা স্বামী সত্যানন্দ গিরি, মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম 'সেবায়তনের' সর্ব্বাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠাতা। সত্যানন্দের সঙ্গে এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। কয়েক বছর পূর্ব্বে মা

আনন্দময়ীর সঙ্গে আমাদের কাশীর আশ্রমে এসে প্রসাদ নিয়েছিল। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন যোগানন্দ।

ধর্ম্মভাব জাগরণ

একদিন যোগানন্দ এসে বললেন, "এই তোমাদের সকলকে যোগ করতে শেখাব, কিন্তু যোগ করতে হবে গুহায় বসে।" গুহা কোথায় পাওয়া যায়? মূক বধির স্কুলের ভিতরে একটা পুকুর ছিল, তার পূর্ব্ব পার জঙ্গলে ভরা ছিল, মধ্যে মধ্যে সাপ বার হত বলে সেদিকে কেউ যেত না। ঠিক হল সেদিকে এক কোণে একটা গুহা তৈয়ার করতে হবে। যোগানন্দই উদ্যোগী হয়ে বাঁশ, দরমার, কোদাল সব জোগাড় করে নিয়ে এলেন। ক'জনে মিলে একদিনেই তিন চার হাত গর্ত্ত করে উপরে বাঁশ দরমার ছাদ তৈয়ার করে মাটি চাপা দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে ফেলা গেল। তারপরই হুকুম হ'ল, ঢুকে পড়। ভয়ে সকলে গেল না। আমরা তিনজন যোগানন্দ, সত্যানন্দ এবং আমি গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। যোগানন্দের নির্দ্দেশ মত যোগাসনে বসে তিনজনে ধ্যান করতে লেগে গেলাম। কি যে ধ্যান করেছিলাম এখন তার কিছুই মনে নেই। বোধ হয় পনের কুড়ি মিনিট পরে হঠাৎ উপর থেকে একটা গম্ভীর ঝঙ্কার স্বর কানে এল, "এই কে গুহার মধ্যে আছ শীঘ্র বেরিয়ে এস।" কি সর্ব্বনাশ! যামিনীবাবুর গলার আওয়াজ! পরলোকগত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মূক বধির স্কুলের প্রিন্সিপাল। ভয়ে ভয়ে তিনজনে বেরিয়ে এলাম। দেখি যামিনীবাবু, স্কুলের মালি এবং আমাদের মধ্যে যারা ভয়ে ভিতরে যায়নি তাদের মধ্যে একজন

দাঁড়িয়ে। বুঝলাম সেই বিশ্বাসঘাতকই আমাদের মুক্তি পথের কালাপাহাড়। তখনই মালিকে হুকুম হল গুহা বুজিয়ে ফেলবার। দু একটি চপেটাঘাতও জুটলো যামিনীবাবুর হাতে। বললেন, 'হতভাগার দল, এর উপর দিয়ে কোনও গরু কি মানুষ যদি চলে যেত তা হলে তিনজনারই জীবন্ত কবর হয়ে থাকত।' যামিনীবাবু আমাদের ছেলের মত স্নেহ করতেন। তাঁর বড় ছেলে শৈলেন্দ্র অধুনা অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল আমাদের সাথী ছিল। রাগে যোগানন্দ সেই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে কিছুদিন কথাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর আমরা যোগানন্দের সঙ্গে সন্ধ্যার পর গ্রীয়ার পার্কে গিয়ে গ্যাসের আলোর দিকে একদৃষ্টে চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকা অভ্যাস করতাম। একজন যোগী হবার ইচ্ছা যোগানন্দের প্রবল ছিল। কেননা কয়েক বৎসর পরেই হঠাৎ পাড়ায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল যে যোগানন্দ এবং পাড়ার আর দুটি ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। দু তিনদিন পরে তিনটি ছেলেকেই ডেরাডুন ষ্টেশনের এক কামরার মধ্যে থেকে ফিরিঙ্গির ছদ্মবেশে ধরে নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে তারা তপস্যার উদ্দেশ্যে হিমালয় যাত্রা করছিল। পরবর্ত্তী কালে যোগানন্দ এবং সত্যানন্দ দুজনেই পুরী কড়ার আশ্রমের স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করে।

আমি কিন্তু এ সব দিকে না গিয়ে, যাকে বলে ঘোর নাস্তিক

এবং বিশৃঙ্খল জীবন তাই কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। মধ্যে চার পাঁচ বছর রাজনীতি নিয়েও খুব মেতে উঠেছিলাম। ফোটোগ্রাফীর ঝোঁকও খুব ছিল, দু পয়সা তাতে আয়ও হত। আর তা ছাড়া ত সরকারী চাকরি ছিলই। কিছুদিন বায়োস্কোপের ছবি তোলার সখও হয়েছিল এবং দু রীলের একটা নির্ব্বাক হাসির ছবিও তুলেছিলাম। কাজেই সঙ্গীও সব সেই রকমই জুটেছিল। ভুলেও ভগবান বা পরতত্ত্ব চিন্তার অবসর ছিল না। বেশ সচ্ছল এবং বেপরোয়া জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলাম।

(৪)

"প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই;
সূর্য্য উঠি বলে তারে, "ভাল আছ ভাই?"

রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আমার জীবনের আঁধার পাঁচিলের ফাটলেও বোধহয় এবার সূর্য্য উঁকি দিলে।

যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের অপ্রত্যক্ষ সংস্পর্শ

হঠাৎ একদিন এক পত্র এল পুরী থেকে যে শচীন এবং আমার ছোট বোন, পুরীর শ্রীশ ঘোষের গুরু একজন যোগীর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। তখনও নাম শুনিনি। আমার ছোট ভাই পুরী বেড়াতে গেল। কিছুদিন পরে ফিরে এসে সে সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করতে লাগল। তিনি নাকি লেন্স দিয়ে ফোকাস করে

তাকে সন্দেশ তৈয়ার করে খাইয়েছেন। রুমালে হাতে নানা রকম গন্ধ তৈয়ার করে দিয়েছেন, তাঁর নাকি গা থেকে সর্ব্বদাই পদ্মগন্ধ বার হয়। ছোট ভাই বিজ্ঞানের ছাত্র, সব কথা একেবারে হেঁসে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। শ্রীশ্রীগুরুদেব পুরী থাকার সময় আমার কখনও পুরী যাওয়া ঘটে ওঠেনি। কিছুদিন পরে শচীন কলকাতায় এল। কিন্তু সে শচীন যেন আর নেই, কথাবার্ত্তায় চালচলনে একটা পরিবর্ত্তন বেশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে নানা রকম গল্প করতে লাগল, তাঁর চিন্তা নিয়েই যেন সর্ব্বদা মশ্‌গুল হয়ে আছে। তারপর সেও চলে গেল, আর আমিও আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজে জড়িয়ে পড়ে সব ভুলে গেলাম।

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস যোগীরাজাধিরাজের সান্নিধ্যে দর্শন লাভ

দু এক বছর পরে শচীন পুরীর কন্ট্রাক্টরী কাজ তুলে দিয়ে কলকাতায় আমাদের পাশের বাড়ী ভাড়া নিয়ে এক প্রেসের ব্যবসা আরম্ভ করে। সেই সময় একদিন আমায় খবর দিলে যে তাঁর গুরুদেব এসেছেন এবং ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। কাল সকালে সে সেখানে যাবে এবং আমি যদি ইচ্ছা করি তার সঙ্গে যেতে পারি। গেলাম তারপর দিন তার সঙ্গে যোগেশ দাদার বাড়ী। সময়টা গ্রীষ্মকাল, বোধহয় ১৯২৯।৩০ সাল হবে। ভবানীপুর ৭নং কুণ্ডুরোড, বিরাট বাড়ী। দেখলাম অনেক মেয়ে, পুরুষ যাওয়া আসা করছে, যেন বাড়ীতে কোনও উৎসব আছে। শচীন

আমাকে উপরে যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে বললে, "দাঁড়াও এখানে, অনুমতি নিয়ে আসি।" ২।৩ মিনিট পরে ফিরে এসে বললে "চল, এখানে জুতা খুলে রেখে খালি পায়ে চল।" উঠলাম দোতলায় প্রকাণ্ড হল ঘর, ঘর জোড়া কারপেট পাতা, ঘরে একঘর লোক, ঘরের পূর্ব্বদিকে একখানি চৌকির উপর গেরুয়া রংয়ের চাদর পাতা, তার উপর বসে গেরুয়া রংয়ের কাপড় জামা পরা এক পরম সৌম্য দর্শন পুরুষ, এক মুখ পাকা দাঁড়া, কিন্তু মাথার চুল সব কাল। বাবা যে কেমন ভাবে সর্ব্বদা বসে থাকতেন তার ছবি 'বিশুদ্ধবাণী' প্রথম ভাগে বার হয়েছে। ছবিখানি আমারই তোলা, ঠিক যেমন ভাবে ঘরের মধ্যে বসেছিলেন সেই অবস্থায়। পাশে বড় পানের কৌটা এবং এলাচের গুড়ার কৌটা। ঘরে ঢুকতেই শচীনের পানে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'এস গো।' শচীন আমায় সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রণাম করলাম। শচীন আমার পরিচয় দিলে। বললেন 'বোসো।' শচীনকে এবং আমাকে পান দিলেন। শচীন পানটি মাথায় ঠেকিয়ে মুখে ফেলে দিলে, আমিও তার দেখাদেখি সেই রকম করলাম। চুপ করে বসে আছি,—নানা রকম আলোচনা হচ্ছে, কিছু কিছু কানে আস্‌ছে, সবই ঘরোয়া কথা,—কোনও রকম ধর্ম্ম আলোচনা শুনতে পাচ্ছি না। অভিভূতের মত সেই অপূর্ব্ব দর্শন বৃদ্ধ সংন্যাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। এমন সময় কে যেন এসে বললেন, "আপনারা সব নীচে আসুন, প্রসাদ দেওয়া হয়েছে!" শচীন প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল,

আমি একটু ইতঃস্তত করছি, অনিমন্ত্রিত খাওয়া ঠিক হবে কিনা। তখন বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাও গো, তুমিও খাও।"

প্রণাম করে উঠে এলাম। নীচে একটি ঘরে ভূরিভোজের আয়োজন। একজন মধ্য বয়সী ভদ্রলোক খাওয়ার তদারক করছেন, শচীন চুপিচুপি বললে ইনিই যোগেশ বসু। কোলে একটি ছেলে। কে একজন জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "এটি অরুণের ছেলে, শুনেছ ত এটি মেয়ে হয়ে গর্ভে এসেছিল, গুরুদেব একে সূর্য্য-বিজ্ঞানের প্রয়োগে বেটাছেলে করে দিয়েছেন ?" পরলোকগত অরুণচন্দ্র বসু ৺যোগেশ দাদার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমাদের গুরু ভাই ছিলেন। তার বাবা ৺অতুলচন্দ্র বসুও আমাদের গুরুভ্রাতা ছিলেন। ঘটনাটা তারপরে শচীন আমায় বলে যে যোগেশ দাদার ছেলে যতীশের স্ত্রী এবং অরুণের স্ত্রী বাবাকে জিজ্ঞাসা করে কার কি সন্তান হবে। তাতে বাবা যতীশের স্ত্রীকে বলেন, 'তোমার বেটাছেলে হবে', কিন্তু অরুণের স্ত্রীকে বলেন, 'তোমার মেয়ে হবে।' তাতে অরুণের স্ত্রী কান্নাকাটি করতে বাবা সূর্য্য-বিজ্ঞান ফোকাস করে অরুণের স্ত্রীর গর্ভের মেয়েকে বেটাছেলে করে দেন। দুঃখের কথা এখন আর সে ছেলেটি জীবিত নেই। ছেলেটির বয়স হবার পরও আমরা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে কি রকম একটা মেয়েলি ভাব ছিল। যা হোক্, সেদিন ত প্রণাম করে বাড়ী ফিরলাম। দু'একদিন পরেই শুনলাম তিনি কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায় চলে গেছেন। মধ্যে মধ্যে শচীনের সঙ্গে তার

গুরুদেব সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা হয়। এর মধ্যে 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' বইখানি পড়ে বেশ কিছু আকৃষ্ট হয়েও পড়েছি।

(৫)

মালদহিয়া শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কাননে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সঙ্গলাভ ও তাঁহার যোগ বিভূতি দর্শন

এই সব ঘটনার বছর খানেক পরে সপরিবার কাশী বেড়াতে যাই। হনুমান ঘাটে এক বাসা ভাড়া করে বাস করতে থাকি। সে সময় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব কাশীর মালদহিয়া আশ্রমে আছেন খবর পেয়ে সকলে মিলে একদিন আশ্রমে গিয়ে হাজির হলাম। পরিচয় দিয়ে খবর পাঠাতেই ডেকে পাঠালেন। প্রণাম করে বসে নানা আলোচনা শুনতে লাগলাম। চলে আসবার সময় তাঁর কাছে ফের আসবার অনুমতি চাইতেই বললেন 'তোমার যখন ইচ্ছা আসবে।' দু'একদিন অন্তর দুপুরে খাওয়ার পর তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হতাম বিজ্ঞান মন্দিরের নীচের ঘরে। তখন বাবার শরীর বেশ সুস্থ ছিল বলে প্রায়ই নানা রকমের বিভূতির খেলা দেখাতেন, পকেটে একটা ছোট লেন্স থাকত, তা দিয়ে ফোকাস করে কত রকম গন্ধ করে দিতেন। কখনও বা কোনও একটা ফুল নিয়ে তার রং অথবা চেহারাই বদলে দিতেন। যেমন, একদিন একটা পঞ্চমুখী জবাকে গোলাপ ফুল করে দিলেন। তখন বিজ্ঞান মন্দিরের কাছে গেলেই সর্ব্বদাই একটা অপূর্ব্ব গন্ধ পাওয়া যেত। (এই গন্ধটা আমি তাঁর দেহ রাখবার পরেও ১০।১১ বছর আগে

পর্য্যন্ত তাঁর উপরের শোবার ঘরে পেতাম, কিন্তু কেন জানি না এখন আর পাই না)। একদিন কি রকম করে শরীরের মধ্যে স্ফটিক ঢুকিয়ে দেন জিজ্ঞাসা করতে বললেন, যে কোনও জিনিষের মধ্যে দিয়ে আর একটা জিনিষকে প্রবেশ করান যায়। প্রমাণ দেবার জন্যে পকেট থেকে একটা আধলা পয়সা নিয়ে (ভিক্ষা দেবার জন্যে আধলা পয়সা তাঁর পকেটে প্রায়ই থাকত) খাটের উপরে রাখা বন্ধ পানের কৌটার উপর রেখে বুড়া আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিতে লাগলেন, হঠাৎ দেখা গেল বুড়া আঙ্গুলের নীচে আধলা পয়সাটি নেই, পানের কৌটার ঢাকনা খুলে দেখালেন যে আধলাটি ডিবার ভিতরে ঠিক পানের খিলিগুলির উপর পড়ে রয়েছে। নিত্য ব্যবহারের জারমান সিলভারের কৌটা আশ্রমের লোকেরাই মাজাঘষা করে পান ভরে দিয়ে যায়। কোনও ফাটা অথবা ছিদ্র নেই। এই রকম কত খেলা যে তখন দেখাতেন তা আপনারা 'বিশুদ্ধবাণী'তে পড়েছেন। এই রকম ভাবে নিত্য যাওয়া আসা করি। কি রকম যেন একটা আকর্ষণ বোধ করতাম। কিন্তু পরতত্ত্ব সম্বন্ধে আকর্ষণের জ্ঞান তখন কিছুই ছিল না, অথবা মনে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা একদিনের জন্যেও হয়নি। এই ভাবে যখন একদিন বাবার কাছে বসে আছি, তখন কে একজন এসে খবর দিলে যে একটি সাহেব বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। বাবা অনুমতি দিতে, সাহেবটি জুতা খুলে আমার পাশে এসে বস্‌ল। বাবা হাসিমুখে তার দিকে একবার তাকিয়ে ফের সকলের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। আর সাহেবটি এক একবার তাঁর মুখের দিকে দেখছে আর দীর্ঘশ্বাস

ফেলে বলছে "Oh God, Oh God! সাহেবটির অল্প বয়স, বেশ সুন্দর চেহারা, দেখলে মনে হয় অবস্থাপন্ন। একটু পরে আমায় বললে স্বামিজীর সঙ্গে কথা বলতে পারে কিনা, তার বাড়ী অষ্ট্রেলিয়া না ঐ রকম কোথায়, ধনীর ছেলে। এই 'ঈয়োগীর' (Yogi) সম্বন্ধে তার দেশে প্রকাশিত এক পত্রিকায় প'ড়ে, সে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে তার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। বাবাকে বলতে তিনি আমায় বললেন, "ওকে বল সকাল বেলা খালি পেটে মাখন মিছরি খেতে।" এই সামান্য ঔষধের কথা ছেলেটিকে বলতে তা বোধ হয় তার ভাল লাগল না। সে আর একটু বসে থেকে "Oh God, Oh God!" বলতে বলতে উঠে চলে গেল। তখনকার দিনে এই রকম বিদেশী পর্য্যটক প্রায়ই শ্রীশ্রীগুরুদেবের কাছে আসত এবং তাদের অনুরোধে দু'একটা যোগের খেলা তাদের দেখাতেন আর তারা দেশে ফিরে ভারতবর্ষের যোগী দেখার গল্প লিখত। সম্ভবতঃ এই রকম কোনও লোকের লেখা ছেলেটি পড়েছিল। এইখানে বিদেশীদের বাবার কাছে যাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠতে, সম্প্রতি শোনা একটি বিদেশীর কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একটি বন্ধু 'ফ্রেঞ্চ মোটর কার কোম্পানীর ফোরম্যান, আমায় বললে যে ডাক্তার ডেনহাম হোয়াইট তাদের খরিদ্দার। একদিন তাদের কারখানায় একটা গাড়ী মেরামত করাতে এসেছিল। তার হাতে একটা বড় সাদা পাথরের আংটি দেখে সে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে যে পাথরটি কি? তখন সে খুব ভক্তির সঙ্গে গল্প করে যে পাথরটি হীরা

এবং শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস নামে একজন হিন্দু যোগী সূর্য্য-বিজ্ঞানের ক্ষমতায় পাথরটি তার চোখের সামনে তৈয়ার করে তাকে উপহার দেন। ঘটনাটি আমাদের অনেকেরই জানা। পাথরটি বাবা কাশী থাকার সময় একদিন ডেনহাম হোয়াইট তাঁর কাছে দেখা করতে যাওয়ায় তাকে তার সামনেই তৈয়ার করে দেন। এই সাহেব ডাক্তার শ্রীশ্রীগুরুদেবের অসুখের সময় তাঁর চিকিৎসা করে। এই রকম বাবার প্রদত্ত হীরার আংটি আমাদের অনেক গুরুভাইয়ের হাতে আছে। যা হোক, আমার পূর্ব্ব কথায় ফিরে আসা যাক্। সাহেবটি ত উঠে চলে গেল এবং বেলাও পড়ে গেল দেখে আরও অনেকে উঠে চলে গেলেন। তখন আমি একেবারে বাবার খাটের পাশে তাঁর পায়ের কাছে বসে। সেই সময়ই বোধ হয় আমার জীবনের ব্রাহ্মমূহুর্ত্ত। কি যে হ'ল আমার বলতে পারি না, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "বাবা আমায় দীক্ষা দিন।" এক মিনিট পূর্ব্বেও সে বাসনা আমার মনে একবারও উদয় হয়নি। বাবা একটু হাসিমুখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, অনুমতি আসুক।" বাস, ঐ পর্য্যন্ত। তার পরে কয়েক দিনের মধ্যেই আমি কলকাতায় ফিরে আসি আর নিত্য কাজে জড়িয়ে পড়ে সব ভুলে যাই।

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক দীক্ষা প্রদান ও দিব্যজীবন লাভ আরম্ভ

২৯ ফাল্গুন ১৩৩৯ সাল। কলকাতায় ৺যোগেশ দাদার বাড়ীতে গুরুদেবের জন্মোৎসব হবে। শচীন এসে খবর দিলে

বাবা ভবানীপুরে এসেছেন। একদিন গিয়ে প্রণাম করে এলাম। হঠাৎ একদিন শচীন এসে খবর দিলে যে বাবা বলেছেন আগামী দোলের দিন তোমার দীক্ষা হবে। সব যোগাড় করে নিয়ে ভোর পাঁচটার পূর্ব্বে হাজির হতে হবে। শচীনই সব যোগাড় করে দিলে। তিনখানা আসন কেন জিজ্ঞাসা করতে বললে, যোগীদের তিন আসনেরই ব্যবস্থা। তারপরে অবশ্য গীতার ধ্যান যোগে "চেলাজিনকুশোত্তরমের" কথা পড়েছি। নির্দ্দিষ্ট দিনে যথারীতি আমার এবং আমার স্ত্রীর দীক্ষা হয়ে গেল। তিনটি কথা আমাকে বললেন, "তোমার ইষ্টমন্ত্র খুব ভাল হয়েছে, তোমার পরমাণু ভাল," আর বললেন যে ক্রিয়া করতে করতে একটা বিশেষ অবস্থায় এলে তাঁকে জানাতে ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা না করতে। আমার পরমাণু ভাল বলতে মনে মনে বললাম, 'হায় দেবতা আমায় এখনও চেননি।' কি রকম যেন একটা অভিভূত ভাব নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পূজার আসন ইত্যাদি একটা ঘরে রেখে তাঁর নির্দ্দেশ মত কুমারী সেবার জন্য গেলাম। কুমারী সেবা হয়ে যাবার পর ঘরে ফিরে এলাম, ঘর একটা অপূর্ব্ব গন্ধে ভরে গেছে। বাড়ীর সকলকে ডেকে সেই গন্ধের ঘ্রাণ নিতে বললাম। বাস, আরম্ভ হল দীক্ষিত জীবন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই চলল দিনের পর দিন যোগিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের প্রদত্ত ক্রিয়া। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন হ্যাঁ হয়ে গেল। বড় যৌথ পরিবার, সকলে আড়ালে মন্তব্য করতে লাগল 'ঢের ঢের সন্ধ্যা আহ্নিক দেখেছি, এ রকম ঘর বন্ধ করে ঘণ্টা কাটান ত কখন দেখিনি।'

'অত যে আদরের খাদ্য, পেঁয়াজ, ডিম, তাও ত্যাগ !' সত্য বলতে কি ডিম, পেঁয়াজ ছাড়তে আমার একটুও কষ্ট হয়নি।

শ্রীশ্রীবাবার কৃপানুভব

কিছুদিন পরে কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে ৺কাশী গেলাম। সেই আমার দীক্ষার পর প্রথম আশ্রম বাস। জিনিষ পত্র বিজ্ঞান মন্দিরের বাহিরে রেখে বাবাকে প্রণাম করতে গেলাম। হেসে বললেন, "এস গো, ভাল আছ ?" ননীদাদাকে বললেন "কালীনাথের ঘর ঠিক করে দিয়ে এস।" পরলোক গত রায় সাহেব ননীলাল মুখোপাধ্যায়, তখনকার আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত গুরুভাই। ননীদাদা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, শিক্ষা-মন্দিরে। তখন শিক্ষা মন্দিরের মেঝে মারবেল পাথরে বাঁধান ছিল। শীতকাল, ঠাণ্ডা লাগবে বলে আমি পাশের ঘরটি নিলাম। জিনিষ পত্র সব নিয়ে সব গোছগাছ করছি, এমন সময় দেখি বাবা স্বয়ং, সঙ্গে ননীদাদা আরও দু'একজন, একেবারে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। ননীদাদাকে বললেন, "চাকর ডাক ঘর ভাল করে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে দিক।" চাকর এল, ঝাড়ু দিতে লাগল। বাবা দাঁড়িয়ে দেখে চলে গেলেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম নগণ্য শিষ্য আমি ! জানিনা এ রকম করুণা আরও কতজনের ভাগ্যে জুটেছে। একলা আমি সেই ঘরে থাকি, কাজেই ক্রিয়ার কোনও অসুবিধাই নেই। ঘরটিতে সর্ব্বদাই একটা কি রকম সুগন্ধ বার হত। ননীদাদাকে বলতে, তিনি বললেন, "ও রকম হয়।" কিছুদিন

পরে কলকাতায় ফিরলাম। এর পরে মধ্যে মধ্যে ছুটি পেলেই যাই। একবার একটু দেরী করে যেতে বললেন, "একটু ঘন ঘন আসনা কেন?" বললাম, "বাবা, যেতে আসতে অনেক খরচ হয়, সব সময় টাকা থাকে না।" ওরে বাবা! সে কি রাগ, বললেন, "কি, বাবা থাকতে ছেলের টাকার অভাব হবে বাবার কাছে আসতে?" সত্যিই তার পরে কখনও কাশী যেতে টাকার অভাব হত না। ছুটী পেলেই যেতাম, সপরিবারে। আশ্রমে জায়গা না পেলে সহরে বাসা ভাড়া করে থাকতাম। কি আনন্দেই না ক'বছর তাঁর সঙ্গে কেটেছে। একান্তে পেলেই কত রকম কথাই না হ'ত। কত রকম পরীক্ষাই না করতেন। একবার ত' বলেই ফেললেন, "বাপু, এ সব হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা!"

(৭)

শ্রীশ্রীগুরুদেবের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের কথা পূর্ব্ব প্রকাশিত আট ভাগ 'বিশুদ্ধবাণীতে' এত বার হয়েছে যে তার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখতে গেলে পুনরুক্তি হয়ে যাবে। প্রতি শিষ্যই, এমন কি অনেক ভক্তও, তাঁর অপরিমেয় শক্তির পরিচয় কিছু না কিছু পেয়েছেন। শিষ্যদের উপলব্ধির মধ্যে কতকগুলি এত গোপনীয় যে সে সব সকলের কাছে বলা যায় না। তিনি যে অন্তর্যামী যোগী ছিলেন এবং কারও কোন কথা যে তাঁর কাছে গোপন থাকত না, এর পরিচয় আমি বহু পেয়েছি। এটা আমার উচ্ছ্বাস নয়। গুরুদেবের কাছে প্রকাশ না করা কারও কোনও গোপন কথা সম্বন্ধে আলোচনা

করতে গেলে, তিনি সকলের সামনে অপর কোনও শিষ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই গোপনীয় ব্যাপারের গল্প হুবহু বলে যেতে লাগলেন এবং শেষে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করলেন। যাকে নিয়ে ব্যাপার তার মুখের দিকে একবারও ফিরে তাকালেন না অথবা এমন কোনও ইঙ্গিত করলেন না যাতে তাকে চেনা যায়। এ রকম ঘটনা আমি অনেক বার দেখেছি। আমার নিজের জীবনের ব্যাপার নিয়েও এ রকম দু'একবার হয়েছে। মনে মনে তাঁর কাছে কোন প্রার্থনা কাতর ভাবে জানালে তা অনেক ক্ষেত্রেই অলৌকিক ভাবে পূর্ণ হত, এর পরিচয় আপনারা অনেক শিষ্যের লেখার মধ্যেই পড়েছেন।

আমার নিজের জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে একটির বিবরণ এখানে দিচ্ছি।—৺পূজার উৎসবে কাশী গিয়েছি। আশ্রমে খুব ভীড়, কোন ঘরই খালি নেই। বিজ্ঞান মন্দিরের বড় ঘরের চাদরের এক কোণে নিজের বিছানা পেতে নিয়েছি, কারণ শ্রীশ্রীগুরুদেব তখন অসুস্থতার জন্য সেখানে বসতেন না, উপরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসতেন। কারও কোনও অসুখ হলে তাঁকে ঘুণাক্ষরেও জানান নিষেধ ছিল।

পূজার উৎসব শেষ হয়ে গেছে; ক'দিনের ভূরিভোজনে একটু মাত্রাধিক্যও করে ফেলেছি। বোধ হয় একাদশীর দিন, আশ্রমে থাকাকালীন অভ্যাসে রাত থাকতে উঠে প্রাতঃকৃত্য সারবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল, অথচ মাথা ঘুরে পড়ে যাইনি, চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি

বসে পড়তেই আবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ফের উঠে দাঁড়াতেই আবার সব ঝাঁপসা হয়ে গেল, বসে পড়তেই সব পরিষ্কার। একি হল? তখনও কেউ বিজ্ঞান মন্দিরের দিকে আসেন নি। যা হোক্, এমনি অবস্থায় খানিক বসে, খানিক দাঁড়িয়ে কোন রকমে প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। ইতিমধ্যে বাবা নিত্য অভ্যাস মত মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে এবং বিজ্ঞান মন্দিরে পূজনীয় ঠাকুরমার ছবিতে প্রণাম সেরে উপরে চলে গেছেন। আমি ঘুরে ফিরে জপ সেরে চুপ করে বসে আছি, উপরে ওঠবার ক্ষমতা নেই। ক্রমে ক্রমে একে একে সকলে নীচে নামতে লাগলেন। ননীদাদাকে সব বললাম। কিশোরী দাদা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিলেন, বিধুদাদা বললেন, ব্লাডপ্রেসারের জন্যে হচ্ছে। এর আগে কিন্তু কখনও ব্লাড-প্রেসার হয়নি। সারাদিন উপবাস করে থেকে কি রকম একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণায় ছটফট্ করলাম। রাত্রে কটকের গুরুভাই শিশির দাদা সমস্ত গা হাত টিপে আরাম দেবার চেষ্টা করলেন, অনেক রাত পর্য্যন্ত। কিন্তু ঘুম একেবারেই হ'ল না। ভোর হয়ে আসছে, জানি যে এবার গুরুদেব নীচে নেমে মন্দিরে যাবেন। কোনও রকমে মুখ হাত ধুয়ে এসে তাড়াতাড়ি জপ সেরে নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

বাবাকে আমার অসুখের কথা একেবারে জানান হয়নি। কারণ তখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শরীর খারাপের জন্যে তাঁকে কারও কোনও অসুখের কথা ঘুণাক্ষরেও জানান মানা ছিল। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দে বুঝলাম যে গুরুদেব নীচে আসছেন

এবং নামতে নামতে কাকে যেন জিজ্ঞাসা করছেন "হ্যাগো, আশ্রমে কার অসুখ করেছে ?" কে যেন বললে "বাবা, কালীনাথের শরীর একটু খারাপ হয়েছে।" বাবা ঘরের মধ্যে দিয়ে মন্দিরে চলে গেলেন প্রণাম করতে, সঙ্গে আরও অনেকে গেল। আমি দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও অন্ধকার, ভোর হতে দেরী আছে, কিন্তু পূজারীরা সব পূজায় বসে গেছে (এখন কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর পূজা আরম্ভ হয়, তাই নাকি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ)। শ্রীশ্রীগুরুদেব মন্দিরে প্রণাম সেরে বিজ্ঞান মন্দিরে ঢুকলেন। (তখনও ৺নবমুণ্ডী প্রতিষ্ঠা হয়নি) ঠাকুরমার ছবিতে প্রণাম করে, একবার আমার দিকে তাকিয়ে সকলকে বললেন, "ওগো, তোমরা সব উপরে এস, কাল সূর্য্য-বিজ্ঞানে একটা আচার তৈয়ার করেছি, খাবে এস।" আমিও সাহস করে চললাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, কিন্তু কই আমার অসুখ, যা দু'মিনিট পূর্ব্বেও ছিল ! বাবা উপরে আহ্নিকের ঘরে ঢুকে একটা বোতল আর চামচ নিয়ে এসে সকলকে আচার পরিবেশন করতে লাগলেন। আমার কাছে আসতে আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "বাবা, আমি খাব ?" ভয় হল টক্ আচার খেতে। বাবা বললেন, "নিশ্চয় খাবে।" হাত পেতে নিয়ে খেলাম, অপূর্ব্ব স্বাদ, টক্ একবারেই নেই। সেখানে একটুক্ষণ বসে থাকবার পর বাবাকে ভয়ে ভয়ে বললাম "বাবা, আমি আজই কলকাতায় ফিরে যাব !" বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা।" নীচে নামতে ননীদাদা বললেন "কিরে, তোর অসুখ ত ভাল হয়ে গেছে, তবে

চলে যেতে চাচ্ছিস্ কেন?" বললাম, "না দাদা, ভয় হয় ফের যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, আপনাদের বিব্রত করব।" যাত্রা করলাম। আসবার সময় ননীদাদা একটা বেদানা এবং একটা কমলালেবু দিয়ে বললেন, "রাস্তায় খাস।" বোধ হয় ধানবাদে এসে এমন ক্ষিদে পেল, যে চোখে আঁধার দেখলাম। যা থাকে কপালে, পুরি, কচুরি কিনে খেয়ে ফেললাম এবং নির্বিঘ্নে সব হজম করে ফেলে, সুস্থ শরীরে বাড়ী ফিরে এলাম। আজ পর্য্যন্ত সে অসুখ আর আমার হয়নি।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের সূক্ষ্মদেহে দর্শন

শ্রীশ্রীগুরুদেবকে সূক্ষ্ম-শরীরে দর্শন অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে, কিন্তু আমার সে ভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমার স্ত্রীর সে সৌভাগ্য হয়েছে, আমার বড় ছেলের সাংঘাতিক টাইফয়েড অসুখের সময়। সে দর্শনের পরের দিন থেকেই তার অসুখ ভাল হতে আরম্ভ করে। বাবাকে সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন সম্বন্ধে যা শুনেছি আর পড়েছি, তাতে দেখেছি যে এ সম্বন্ধে আমাদের গুরুভগ্নীরাই ভাগ্যবতী। শ্রদ্ধেয়া দিদিরা রাগ না করলে বলতে হয়, বাবার তাঁদের সম্বন্ধে একটু স্নেহাধিক্য ছিল। তাঁদের জন্যে সবই বিশেষ ব্যবস্থা। তাঁদের জন্যে একেবারে পৃথক্ মহল, তাঁরা যখন বাবার কাছে আসতে চাইবেন আমাদের তখন উঠে আসতে হত। আশ্রমে তাঁরা আগে না প্রসাদ পেলে আমাদের উপবাস, এই রকম আরও কত। চিরদিনই বাবা পুরুষ এবং স্ত্রী শিষ্যদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে গেছেন।

(৮)

বণ্ডুল আশ্রম

শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের মধ্যে বণ্ডুলের আশ্রমই তাঁর খুব প্রিয় স্থান ছিল। জ্ঞানগঞ্জের শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস-দেবের দেওয়া শ্রীশ্রীহরিহর বাণলিঙ্গ মহাদেব সেখানে প্রতিষ্ঠা করা আছে। বাবা যখন বণ্ডুল আশ্রমের দোতলা এবং নাট-মন্দির তৈয়ারী করাবার জন্য শচীনকে সেখানে পাঠান তখন শচীনের সঙ্গে আমিও কিছুদিন সেখানে বাস করে এসেছিলাম। অবশ্য তার পরেও কয়েকবার বণ্ডুলে গেছি। নির্জ্জন মন্দিরে বসে থাকতাম লিঙ্গের নানা রং পরিবর্ত্তন দেখবার জন্যে। অনেক দিন বণ্ডুলে যাওয়া ঘটে ওঠেনি, জানিনা এখনও সে রকম রং বদলান দেখা যায় কিনা। একবার শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশে বণ্ডুলে গিয়েছিলাম, কুমারী ভোজনের আয়োজনে সাহায্য করতে। আমাকে বললেন, "দেখ, এ তোমার কলকাতা কিম্বা কাশীর কুমারী সেবা নয়, এঁরা সব গ্রামের কুমারী, পাঁচ, দশ মাইল দূর দূর থেকে গরুর গাড়ী করে বা পায়ে হেঁটে সব আসবেন তোমাদের সেবা নিতে গ্রামের মেঠো পথ ভেঙ্গে। এঁরা এলে জল দিয়ে পা ধুয়ে দেবে, গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে।" গেলাম বণ্ডুল। কুমারী ভোজনের দিন এক এক করে কুমারী মায়েরা আসতে লাগলেন আর আমি ঘটীতে জল নিয়ে তাঁদের পা ধুইয়ে দিতে লাগলাম আর বিলাসী পাড়ার নৃপেন্দ্র দাদা নূতন গামছা দিয়ে তাঁদের পা মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। ফিরে এসে

বাবাকে সব গল্প করতে, বাবা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বগুলে এখনও সব উৎসবেই কুমারী সেবা হয় এবং আশ্রমের পরিচালনা বাবার নির্দ্দেশ মত আমাদের পূজনীয় গুরুবংশ এবং কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট শিষ্যের ব্যবস্থায় বেশ ভাল ভাবেই চলে। কলকাতা এবং ভারতের অনেক জায়গা থেকে তীর্থযাত্রা হিসাবে বহু শিষ্য ভক্তের আগমন প্রায় বার মাসই হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে আমার কাছে সেখানকার সুব্যবস্থার কথা বলেছেন। তবে বর্ষাকালে, পাকা রাস্তা না থাকায় কাদায় পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। কিন্তু আমার মনে পড়ে একবার আমি আমাদের গুরুপুত্র স্বর্গীয় দুর্গাদাদার সঙ্গে বর্ষাকালে এক হাঁটু জল কাদা ভেঙ্গে ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় তীর্থযাত্রার পথ কষ্টসাধ্য হলে মনের শুচিতা বৃদ্ধি করে।

(৯)

এইবার কাশীর শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে আমার কাহিনী শেষ করব। বয়স হয়েছে, স্মৃতিচারণ করতে ভালই লাগে, বিশেষ করে তা যদি গুরুদেবকে কেন্দ্র করে হয়। বারাণসীর শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম স্থাপনার গোড়ার কথা আপনারা বোধহয় "বিশুদ্ধবাণী" অষ্টম ভাগে গুরুভ্রাতা শ্রীযতীশচন্দ্র বসুর লেখায় পড়েছেন। না পড়ে থাকলে দয়া করে পড়বেন, অনেক না শোনা কথা জানতে পারবেন। যতীশ দাদার মত শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একান্ত সান্নিধ্যে পাওয়ার মত সৌভাগ্য খুব কম শিষ্যের ভাগ্যেই ঘটেছে।

কাশীতে বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম হল, বাড়ী তৈয়ার হ
তিন তলা। নাম দেওয়া হল 'বিজ্ঞান-মন্দির।' কেন
ওখানে সূর্য্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে। শিষ্যদের কত উৎসাহ
কত আশা। সূর্য্য-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রও কিছু
এসে গেল। তার অনেকগুলি জিনিষ এখনও বিজ্ঞান মন্দিরের
তিন তলা ঘরে আছে।

শিষ্যেরা বড়ই আশাভঙ্গ হলেন। মনে মনে সকলেই গর্ব
অনুভব করছিলেন যে এইবার সূর্য্য-বিজ্ঞানের অসীম বলের
অধিকারী হয়ে জগৎকে তাক্ লাগিয়ে দেব। আমার কিন্তু মনে
হয় সূর্য্যবিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা না হয়ে আমাদের পরম
কল্যাণই হয়েছে। জ্ঞানগঞ্জের পূজ্যপাদ স্বামিজীরা ত্রিকালজ্ঞ
মহাপুরুষ। তাঁরা বুঝে ছিলেন যে লোকালয়ের মধ্যে ও রকম
একটা অসীম ক্ষমতাশালী বিজ্ঞান শিক্ষা দিলে তা থেকে শুভ
অপেক্ষা অশুভের আশঙ্কাই বেশী। আমাদের হাতে পড়ে তার
অপব্যবহারের ভয়ই বোধ হয় অধিক ছিল। ক্রিয়ানিষ্ঠায়
সামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েই অনেকে শুনেছি আত্মহারা
হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। পুরাতন শিষ্যদের মধ্যে
এমন লোকের কথাও শুনেছি যাঁর ইচ্ছাশক্তিতে চলন্ত মোটর
গাড়ী থেমে যেত। তাঁরই আবার এমন পতন হল যে শেষে
সব শক্তি হারাতে হয়েছে। নিজেই দেখেছি এমন গুরুভ্রাতাকে
যাঁর সত্যই কিছু করুণা লাভ হয়েছিল, আবার তাঁকেই দেখেছি
নিজের দোষে সব হারাতে। কাজেই আমার মনে হয় সূর্য্য-
বিজ্ঞানের মত ও রকম একটা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন বিজ্ঞান

আমাদের শেখালে তার থেকে আমাদের অমঙ্গলের ভয়ই বেশী ছিল।

আমাদের মঙ্গলের জন্যে শ্রীশ্রীগুরুদেব কাশীর আশ্রমে মন্দির করালেন, নিজে শিব প্রতিষ্ঠা করে শিষ্যদের দিয়েও শিব প্রতিষ্ঠা করালেন, ৺দুর্গামূর্ত্তি স্থাপন করালেন, নিজে ৺গোপালের বিগ্রহ স্থাপন করালেন এবং অর্পণ নামায় নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন ভবিষ্যতে শিষ্যদের দিয়ে আরও শিব প্রতিষ্ঠা করাবার এবং একটি ৺রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করাবার। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করলেও এখন পর্য্যন্ত ৺রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপন করাতে পারলাম না। একবার গুজব শুনেছিলাম যে কোনও পরলোকগত শিষ্য নাকি তাঁর উইলে ৺রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করাবার ব্যবস্থা করে গেছেন। কিন্তু সেটা কেবল শোনা কথা, কোনও প্রমাণ পাইনি।

৺নবমুণ্ড সদ্ধাসন

বাবার মর্ম্মর বিগ্রহও শিষ্যদের একান্ত ভক্তি ও আগ্রহের নিদর্শন। কিন্তু—৺কাশীধামে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পরম কল্যাণকর অবদান, তাঁর অগণিত শিষ্য এবং ভক্তদের প্রতি তাঁর করুণার নিদর্শন, শ্রীশ্রীনবমুণ্ডী মহাআসনের প্রতিষ্ঠা। ৺নবমুণ্ডী আসন সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে "বিশুদ্ধবাণী" তৃতীয় ভাগে পরম পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ দাদার লেখা "শ্রীশ্রীনবমুণ্ডী মহাসন" পড়া উচিত। কিন্তু আমার মত সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোক যে তার কতখানি

বুঝতে পারবেন তা সন্দেহ হয়। আমার অনেক পরিচিত লোক অনেক সময় আমাকে বলেন, "আপনাদের ভাবনা কি মশাই, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ রয়েছেন জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতে পারবেন।" আমি বলি,—'ওরে বাবা, গোপীনাথ দাদাকে জিজ্ঞাসা? তা'হলেই 'রাত কাবার।' আর তা ছাড়া ওঁর আবার অভ্যাস আছে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করে বসেন "কি বুঝলে বলত?" সর্ব্বনাশ! শেষে কি সেই কালিদাসের গল্পর মত 'উষ্ট্র' কে 'উড্র' বলে পাঁচজনার সামনে নিজের মূর্খতার পরিচয় দিয়ে বসব। না মশাই, ও "সেবায়"তে যেটুকু পাওয়া যায় তাই ভাল, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মেনে "পরিপ্রশ্নেন" প্রয়োগ করবার দুঃসাহস আমার একেবারেই হয় না। ঐ যে 'রাত কাবার' কথাটা ব্যবহার করেছি ওর মধ্যে অতীতের এক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।—

কাশীতে ৺শিবরাত্রি উপলক্ষে বাবার কাছে সব জড় হয়েছি। শিবরাত্রির দিন নির্জ্জলা উপবাস। (আমাদের পালন করবার মধ্যে ঐ একটা উৎসবেই নির্জ্জলা উপবাস করবার কথা, বাকি সব কুমারী মায়েদের সেবা হয়ে গেলেই সকলেই জল খেতে পারতাম। বাবাকেও আমি অন্য কোনও উপবাস করতে দেখি নাই। শাস্ত্রে বিধিই'ত আছে পড়েছি "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি, নচৈকান্তমনশ্নতঃ"। সারাদিন উপবাস করে রাত্রের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রহরের পূজা শেষ করে সকলে এসে বিজ্ঞান মন্দিরে জড় হয়েছি। রাত জাগতে হবে শেষ প্রহরের পূজার অপেক্ষায়, পূজনীয় গোপীনাথ দাদাও আছেন। বাবা উপরে চলে গেছেন।

কি করে রাত জাগা যায়, বাবার শরীর ভাল নয়, গান বাজনায় গোলমাল করলে চলবে না। একজন বললেন, গোপীনাথ দাদাকে কিছু বল্‌তে বলা যাক্। তাই হ'ল। দাদা বললেন, 'কি বিষয়ে জানতে চান বলুন?' হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে বসলেন "দাদা, ভীম একাদশী কেন বলে?" হায়রে কপাল! সারাদিন উপবাস করে থেকে তাঁর অবচেতন মনে বোধ হয় একাদশীর কথাটাই উঁকি দিচ্ছিল। বাস, তার পরেই আরম্ভ হল দাদার ভীম একাদশীর উপর বক্তৃতা। ঐ সামান্য প্রশ্নে যে হিন্দুশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, বাইবেল, শেষ পর্য্যন্ত কোরানও এসে পড়তে পারে এ ধারণার বাইরে। আমরা হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছি, অর্দ্ধেক বুঝছি বাকি অর্দ্ধেকের কিছুই মাথায় ঢুকছে না, কিন্তু মাথা সমানে নেড়ে যাচ্ছি যা আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন করে থাকি, দাদার এই সব তত্ত্ব আলোচনা শুনে। (নিজেকে দশজনের একজন ধরে নিলেই রাগ হবে না) কখন যে 'রাত কাবার' হয়েছে কিছুই বুঝতে পারিনি, সিঁড়িতে শব্দ শুনে বুঝলাম, বাবা নামছেন। আমরাও উঠলাম। কি দিনই সব গিয়েছে!

যা হোক্, এবার আমার পূর্ব্ব কথায় ফিরে আসা যাক্। ৺নবমুণ্ডী সম্বন্ধে তার তত্ত্বকথা বুঝি আর নাই বুঝি আমাদের কাছে চরম সত্য হল আসনের বাহিরে পাথরের ফলকে লেখা শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের বাণী "পবিত্র ভাবে জপ করিলে ফল অবশ্যম্ভাবী, অনাচারে কু ফল।" এ যে কত বড় সত্য তা যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁরাই বুঝেছেন। কিন্তু আমার জ্ঞানে পবিত্র

ভাবে জপ করা মানে গোবর গঙ্গাজল ছিটিয়ে আর পট্টবস্ত্র পরে জপ করলেই পবিত্রতা আসে না। মনকে ত পবিত্র করতেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও পবিত্র হওয়া চাই। আমার মনে পড়ে, শ্রীশ্রীনবমুণ্ডী আসনের প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে, যখন চারদিকে পাঞ্জাবী কলোনী গড়ে উঠেনি, পাঁচিলের বাইরে সব জঙ্গলে ভরা ছিল, রাত্রে ত বটেই দিনের বেলাতেও অনেকে ওখানে একলা বসে জপ করতে ভয় পেতেন, তখন দশ মিনিট ওখানে বসলে যে অনুভূতি পাওয়া যেত এখন এক ঘণ্টাতেও তা পাওয়া যায় না। কেন এমন হয়? আমারই মনের দোষ না এখন পূর্ব্বের সে শান্ত পবিত্র ভাব ওখানে আর পাওয়া যায় না? বোধহয় আমারই দোষ। মনকে আর পূর্ব্বের মত বশে আনতে পারি না। পবিত্র ভাবে জপ করতে পারলে যে কামনা পূর্ণ হয়, এর পরিচয় আমি ত' পেয়েছিই, আরও অনেকে পেয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় পাপ করে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার কামনা করে বসলে সম্পূর্ণ ক্ষমা পাওয়া যায় না। তবে কিছুটা লাঘব হয়, যদি সত্যই তেমন ভাবে জপ করতে পারা যায়। এ আমার পরীক্ষিত।

৺নবমুণ্ডী আসনে নিত্য ভোগ পূজার ব্যবস্থা শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রবর্ত্তিত নয়। এ ব্যবস্থা গুরুভ্রাতা বীরেন্দ্র দাদার আশ্রম পরিচালনার সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে। কোনও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত না থাকাতেও এ রকম নিত্য পূজা ভোগের ব্যবস্থায় আসনের কি গৌরব বৃদ্ধি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু এতে যে আসনটি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন অবস্থায়

থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রস্তর ফলকে "হোম, পূজা এবং বলি হইতে পারিবে" বলে লেখা আছে বলেই বোধ হয় বীরেন্দ্র দাদা নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে গেছেন। ৺বীরেন্দ্র দাদার প্রবর্ত্তিত আর একটি খুব ভাল ব্যবস্থা হ'ল আশ্রমে প্রতিদিন একটি করে কুমারী মায়ের সেবা। এই সেবা খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে গেছেন আমাদের আশ্রম-বাসী গুরুভাই সনত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবার "অর্পণ নামা"য় নির্দ্দেশ আছে যে আশ্রমে দু'জন ব্রহ্মচারী শিষ্য থাকতে পারবে। কিন্তু আমরা আজ পর্য্যন্ত সনত দাদাকেই একমাত্র ব্রহ্মচারী শিষ্য হিসাবে পেয়েছি যিনি বহু বছর ধরে আশ্রমে বাস করে সেবা পূজা করেছেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব আশ্রম পরিচালনার জন্যে একটি অর্পণ নামা এবং একটি নিয়মাবলী রেখে গেছেন। এই অর্পণ নামা প্রতি শিষ্যেরই পড়া উচিত, সামান্য দলিল হিসাবে অবহেলা করা উচিত নয়। আমার মনে হয় এই অর্পণ নামা এবং নিয়মাবলীতে গুরুদেবের আদেশ আছে, এবং তা না মানলে তাঁর আদেশ অমান্যের পাপ হয়। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে অর্পণ নামার মধ্যে তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(১০)

শ্রীশ্রীগুরুদেব সর্ব্বদাই বলতেন 'কর্ম্মভ্যো নমঃ'। কথাটার মানে আর কিছু বুঝি আর নাই বুঝি এইটুকু বুঝতাম যে আমাদের কর্ম্ম একমাত্র গুরুদত্ত ক্রিয়া। মুখে ত বলতেনই, তা ছাড়া আমাকে লেখা প্রতি পত্রে আছে "সর্ব্বদা ক্রিয়ার

দিকে লক্ষ্য রাখিবে।" একটি পত্রে লিখছেন "বাবা, ক্রিয়ার দিকে একটু লক্ষ্য রাখিলে, যাই হোক্, মনে একটা আনন্দ থাকিবেই থাকিবে।" আর একটিতে লিখছেন, "দৃঢ় ভাবে ক্রিয়া করিতে অবহেলা করিবে না এবং অভ্যাসও ত্যাগ করিবে না, তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" এইজন্যেই ৺নবমুণ্ডী আসনে জপ করার পরও মন সন্তুষ্ট হয় না, যতক্ষণ না কোনও নির্জ্জন ঘরে বসে ক্রিয়া করতে পারা যায়। এ যেন আফিমের নেশা। পুরাতন পত্র ঘাটতে ঘাটতে একটি পত্রে কয়েকটি ভাল কথা পেলাম, এখানে লিখে দিলাম—"নাবিক হইয়া জল দেখিয়া ভয় করিলে চলিবে না। সংসার রূপ দ্বীপান্তরে থাকিতে হইলে দ্বীপান্তরীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ হইয়াই থাকে। তাহার জন্য চিন্তা কি?" এ ছাড়া প্রতি পত্রে "কখনও কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবে না", এ কথা ত আছেই। একবার হাঁটুতে বাতের মত হওয়ায় ক্রিয়ায় কষ্ট হত। তাতে লিখলেন, "দৃঢ় ভাবে ক্রিয়া করিলে সব শুভ হইবে।" সত্যই হয়েছিল, ব্যথায় চোখ দিয়ে জল বার হওয়াতেও ক্রিয়া করেছি, ফলও পেয়েছি। ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে গুরুদেব ছাড়া অপর কাহাকেও জানান নিষেধ ছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের তিরোভাবের পরও কিছু জানবার ইচ্ছা থাকলে, আমি লক্ষ্য করেছি এবং বোধ হয় আরও অনেক শিষ্যই লক্ষ্য করেছেন যে ক্রিয়া করতে করতে আপনা হতে এমন সব অভ্যাস এসে পড়ে যে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে হয় এ আমি কোথায় শিখলাম।

বাবা বলেছিলেন, "আমি আমার প্রতি শিষ্যকেই এক এক

ভাল করে সোনা দিয়ে যাব।" সত্যই তিনি তা দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সোনা দিয়ে গেলেই কি তা আমরা সকলে রাখতে পারি? অপচয় আছে, অপব্যবহার আছে, আর সব চেয়ে বড় কথা আছে "bad investment." ভুল ভাবে খাটাতে গেলেই ডুবতে হবে। আমি নিজেই ত' পরের কথায় ভুলে প্রায় সিকি অংশ হারিয়ে ফেলেছি, যার আর পুনরুদ্ধারের আশাই নেই।

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

সংসারে থাকলে ঘাত প্রতিঘাত আছেই। বাড়ী, গাড়ী, টাকা না হবার দুঃখ আছে। সংসারে নানা অশান্তির দুঃখ আছে। কিন্তু সকল আঘাত খেয়ে মনকে দৃঢ় করবার শক্তি, কষ্টকে সহ্য করবার শক্তি, মনে শান্তি আনবার সর্ব্বব্যাধিহর ঔষধ গুরুপ্রদত্ত ক্রিয়া, এ সত্য সত্য। ধন দৌলত? সে ত অনেককেই পেতে দেখলাম, আবার ফকীর হতেও দেখলাম। মনে ভাবছেন আমি মস্ত হিসেবী, মস্ত খেলোয়াড়। ছক পেতে ঘুঁটি সাজিয়ে বসলেন, ভাবলেন এইবার এমন এক একটা চাল দেব যে সংসারকে তাক লাগিয়ে দেব। কোথা থেকে এমন একটা ঘূর্ণি ঝড় এল যে ছক ঘুঁটি কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল তার ঠিক নেই। তখন আবার সেই ছক পেতে একটা একটা ঘুঁটি খুঁজে বার করতেই সারাজীবন কেটে গেল, খেলা আর হল না। কাজেই, যে সোনা তিনি দিয়েছেন তাই মাজাঘষা করে দিন কাটিয়ে যাওয়াই ভাল। কিছু কৃপা পাই ভালই, না পেলে ভাববো আমার প্রাপ্য নেই। এই কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের

একজন গুরুভাই বললেন যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসবের যখন সর্ব্ব প্রথম প্রস্তাব শিষ্যদের মধ্যে হয়, তখন আমাদের কোনও সংসার ত্যাগী গুরুভ্রাতাকে পত্র দেওয়া হয় তাঁর মত নেবার জন্যে। তাতে তিনি লিখে জানান যে 'কি হবে এই সব বাহ্য আড়ম্বর ক'রে গুরুদেবের প্রতি ভক্তি দেখানয়, তিনি যে ক্রিয়া আমাদের দিয়েছেন তার নিত্য অনুশীলন করলেই তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখান হবে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।" কথাটার মধ্যে খানিকটা যে যুক্তিযুক্ততা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেদিন এক গুরুভাই বললেন "বাবা যে এখনও আমাদের কাছে আছেন তা দাদা কিছুই বুঝতে পারি না।" বোধ হয় কোনও একটা ঘা খেয়েছেন। নিশ্চয় আছেন, চোখে না দেখা গেলেও নানা অনুভূতিতে তাঁর উপস্থিতি যে বোঝা যায় এর প্রমাণ ত অনেকেই পেয়েছেন। এই ত কিছুদিন পূর্ব্বেই বিজ্ঞানমন্দিরে তাঁর প্রিয় কোনও বিষয় নিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করছিলাম, হঠাৎ ঘর সেই চিরপরিচিত অপরূপ গন্ধে ভরে গেল। ক্ষেত্রদাদা, গোপীনাথদাদা, গৌরীদাদা, জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি আরও অনেক গুরুভাই বসে ছিলেন। পাশেই ক্ষেত্রদাদা, গৌরীদাদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দাদা?" বললেন "আরে ভাই, এ কি ভোলা যায়? এ গন্ধ যে নাকে লেগে আছে।" ঠিক অনুরূপ ব্যাপার নিয়ে ভবানীপুরেও একদিন গন্ধে ভরে গেল। নেই কি? নিশ্চয় আছেন, তিনি যে বলে গেছিলেন থাকবেন। একটু মনে মনে ভাবুন না,— ঐ'ত তিনি খাটের উপর তেমনি করে বসে আছেন, নীচে বসে

ননীদাদা তেমনি তসরের কাপড় জামা, ঐ'ত রজনীদাদা, জানকীদাদা, ইন্দুদাদা, অরুণ দেওয়াল ঘেসে বসে, যোগেশদাদা তেমনি গলা বন্ধ কোট গায়ে, ঐ'ত এসে ঢুকলেন বিধুদাদা, হাঁটু গেড়ে বসে পান নেবার জন্যে হাত বাড়ালেন। আরও কত কত পরিচিত, অপরিচিত। প্রত্যেকের পাশেই জায়গা খালি আছে। আমরা গিয়ে বস্‌ব না? বেশী ভাবতে গেলে চোখে জল এসে যায়।

(১১)

উপসংহার

এই হ'ল আমার আধুনিক যুগের জগাই মাধাই উদ্ধারের গল্প। কিন্তু উদ্ধার কি সত্যই হয়েছে? কি জানি। শ্রদ্ধেয় অক্ষয় দত্তগুপ্ত দাদার রচনা শ্লোকের এই কথাটি বড় মনে লাগে—

"তারয় মাং ভবতারণ তূর্ণম্।
গৌরবমস্তু তবাত্র চ পূর্ণম্॥

সত্যিই ত আমার মত পাপীকে উদ্ধার করলে সে'ত আপনারই গৌরব।

জীবনে তাঁর কৃপা না চাইতেও অনেক পেয়েছি, আবার অনেক কিছু নিজের দোষেই হারিয়ে ফেলেছি।

জীবনের সায়াহ্নে এসে এখন সব ছেড়ে একটির অপেক্ষায় বসে আছি যা ব্যক্ত করলাম রবীন্দ্রনাথের "পথের শেষের" কয় লাইন দিয়ে।—

"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি।
এখন শুধু আকুল মনে যাচি,
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।"

আত্মার পূর্ণ জাগরণ ও তাহার পরিণতি

পদ্মবিভূষণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
এম-এ, ডি-লিট।

(১)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাতে বলা হইয়াছে যে এই জগতে সকল আত্মা প্রকৃত জাগ্রৎ অবস্থায় নাই। তাহারা মায়িক জগতে অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া মোহনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে। তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত ঐ মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মায়াতীত চিন্ময় সত্তা অনুভব করিতে পারিবে না—চিন্ময় দিব্য জগতে সঞ্চরণ করা ত দূরের কথা। ঠিক সেই প্রকার এই জগতে এমনও মহাপুরুষরূপী আত্মা আছেন যাঁহারা সংযমী বলিয়া এই মোহময় জগৎকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি নিরন্তর চিদ্‌ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। তাঁহারা চিদ্‌আকাশ এবং তদ্‌উর্দ্ধবর্ত্তী চিন্ময়রাজ্য নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

এই শ্লোকটিতে সংযমী অথবা প্রবুদ্ধ এবং মূঢ় অথবা নিদ্রিত আত্মা সকলের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে জগতের অধিকাংশ জীবই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রচলিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

এই ঘুমেরই প্রকার ভেদ মাত্র। অর্থাৎ আমরা ব্যবহার ভূমিতে যেটিকে জাগ্রৎ অবস্থা বলিয়া মনে করি তাহাও প্রকৃত জাগ্রৎ নহে। তাহা বিজ্ঞান দৃষ্টিতে নিদ্রারই অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে মনুষ্য মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য এই মোহ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠা এবং পূর্ণভাবে জাগ্রৎ হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ক্রম বিকাশের ফলে জীবভাব হইতে শিবভাবে উন্নীত হওয়া এবং আত্মার পূর্ণত্বলাভ করা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার দক্ষিণা-মূর্ত্তি স্তোত্রে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই মোহনিদ্রা হইতে যিনি জীবকে জাগাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। জীব যখন পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠে তখন সর্ব্বপ্রথমেই অনুভব করে যে এই জগৎ তাহার বাহিরে নহে, কিন্তু তাহার অন্তরে রহিয়াছে। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন বিরাট্ নগর প্রতিবিম্বিত হয় এবং ঐ প্রতিবিম্বিত নগর যেমন দর্পণেরই অন্তর্গত, দর্পণ হইতে বহির্ভুক্ত নহে, ঠিক সেই প্রকার সমগ্র বিশ্বই আত্মারূপ স্বচ্ছদর্পণে প্রতিবিম্বিত বুঝিতে হয়। বস্তুতঃ এই বিশ্ব দ্রষ্টা আত্মারই নিজের অন্তর্গত এবং তাহার বহিঃস্থিত নহে। মায়া বশতঃ যাহা অন্তরের বস্তু তাহাকে অন্তরে না দেখিয়া বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্‌গুরু যখন শুদ্ধবিদ্যা সঞ্চার করিয়া জীবকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলেন তখন জীব নিজের আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া সমগ্র বিশ্বকে নিজের অন্তর্গত বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে এই তথাকথিত বাহ্য জগৎ হইতে আন্তর জগতে প্রবেশ করাই সাধনার উদ্দেশ্য এবং গুরু-কৃপারও তাহাই একমাত্র লক্ষ্য।

এই যে আন্তর জগতে প্রবেশের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে ক্রম রহিয়াছে। প্রথমতঃ অজ্ঞান জগৎ হইতে জ্ঞান জগতে প্রবিষ্ট হইতে হয়। তাহার পর পরাসংবিতে নিত্যধামের প্রাপ্তি ঘটে। অজ্ঞানের জগতে অবস্থান কালে অনুভব হয় যে এই জগৎটি ভেদজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু যখন গুরু-কৃপাতে জ্ঞানের উদয় হয় তখন বুঝিতে পারা যায় যে বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞেয় বস্তু বাহিরে কিছু নাই। জ্ঞেয় বস্তু বাহিরে আছে এই জ্ঞান ভ্রম। এই মার্গে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ সাকার জ্ঞানই—ইহাই বাহ্য-রূপে অথবা স্থূলরূপে কল্পিত হইয়াছে। যাহাকে আমরা মায়া বলিয়া বর্ণনা করি তাহা ক্রিয়াশক্তিরই নামান্তর। ইহারই প্রভাবে সাকার জ্ঞান বাহ্য পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানরাজ্যে জ্ঞানই এক প্রান্তে সাকার জ্ঞান বা জ্ঞেয়রূপে ভাসমান হয় এবং অন্য প্রান্তে ঐ জ্ঞানই জ্ঞাতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানরাজ্য অতিক্রম করিতে হইলে জ্ঞানের এই জ্ঞেয়ভাব ও জ্ঞাতৃভাব দূর করা আবশ্যক। ইহা করিতে পারিলে জ্ঞান বিশুদ্ধ হয়।

এই বিশুদ্ধ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞানরাজ্য হইতে সংবিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মায়া বা অজ্ঞানরাজ্যে ভেদজ্ঞান প্রবল। জ্ঞানরাজ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সংবিদ্‌রাজ্যে ভেদের লেশমাত্রও নাই। ইহা অভেদ জ্ঞানের অদ্বৈতভূমি। ইহা তুরীয়রাজ্যরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইহার পর অখণ্ড প্রকাশ, যাহাকে তুরীয়াতীত বলিয়াও উল্লেখ করা চলে না।

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপান্তর লাভ করা— এই ব্যাপারটি গুপ্তরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইজন্য গুপ্তপথে প্রবেশ করিতে হয়। গুপ্তধামের ব্যাপার বস্তুতঃই রহস্য।

এই যে রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহারই নাম জাগরণ। পূর্ণ জাগরণই পূর্ণ রূপান্তর অথবা অখণ্ড মহাপ্রকাশ-রূপে বিশ্রাম। মায়ারাজ্যে আত্মা ভেদজ্ঞান হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কারণ এখানকার বিদ্যা অশুদ্ধ বিদ্যা—ইহা মায়ার কঞ্চুক। ইহার পর কলার নিয়ন্ত্রণও আছে এবং অন্যান্য কঞ্চুকের আবরণও রহিয়াছে। অন্তর্জগতে প্রবেশের প্রথম উপায় শুদ্ধবিদ্যার উন্মেষ। ইহার ফলে পশুত্ব নিবৃত্ত হয়। পশুভাবে অবস্থিত পুরুষ সংবিৎ মার্গে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ শুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মহাশক্তি মার্গে প্রবেশ অসম্ভব।

(২)

আত্মার বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রতীতির ভেদ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রতীতি অনুসারেই কোন প্রমাতা আত্মাকে অপ্রবুদ্ধ অথবা নিদ্রিত বলা হ-য়া থাকে এবং অন্য কোন প্রমাতাকে অপ্রবুদ্ধ না বলিয়া প্রবুদ্ধকল্প বলা হয়।

এই বিশ্ব-ভুবন (যাহা মহামায়া ও মায়ার অন্তর্গত) অনাশ্রিত শিব হইতে কালাগ্নি রুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের ঊর্দ্ধ শিখরে অনাশ্রিত শিব বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং সকলের

নীচে কালাগ্নি রুদ্র]খেলা করিতেছেন। এই বিশ্ব প্রকাশাত্মক বলিয়া যদিও ইহা প্রকাশের ভিত্তিতে লগ্ন রহিয়াছে তথাপি ভবী আত্মা অর্থাৎ অপ্রবুদ্ধ আত্মা মনে করে যে সব কিছু তাহার বাহিরে। 'ভব' বলিতে এখানে ভেদজ্ঞান বুঝিতে হইবে। ভেদজ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধ আত্মাও ভবী নামে অভিহিত হয়। ইহারা মায়া দ্বারা অভিভূত থাকে বলিয়া অভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকে।

ভবিগণের ঊর্দ্ধে আর এক প্রকার আত্মা আছে—ইহাদের ভেদজ্ঞান নাই। কিন্তু ভেদজ্ঞান না থাকিলেও তাহার সংস্কার আছে। ইহাদিগকে "ভব পদী" বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সকল আত্মা শুদ্ধবিদ্যা পদে অনুপ্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্তরে বিদ্যমান থাকে। এই সকল আত্মা শুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে আন্তরিক সংস্কারাদি ভিন্নবৎ অনুভব করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞান শূন্য এবং কাহারও কাহারও বাহ্যজ্ঞান থাকে। যাহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে তাহাদিগকে পরাসংবিৎ তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। ইহারা পশু হইলেও যোগ্য পশু, কারণ ইহারা অধিকারী। এই সকল চিদ্ অণু মনে করে যে গ্রাহক ও গ্রাহ্যরূপে বিশ্বের দুইটি বিভাগ আছে। যে অংশ গ্রাহক তাহা অজড় ও চিন্ময় এবং যে অংশ গ্রাহ্য তাহা জড় ও অচিৎ। এই জাতীয় পশু মায়া দ্বারা মোহিত হয় না, কারণ এই যে গ্রাহ্য বস্তুকে জড় ও নিজ হইতে ভিন্ন মনে করা

ইহাই মায়া, এই সকল পশু নিজের স্বরূপকে চিনিতে পারে না। ইহারাও পূর্ব্ববর্ণিত "ভবী আত্মার" অন্তর্গত।

দুই প্রকার প্রমাতার কথা বলা হইল। ইহাদের মধ্যে কেহই প্রবুদ্ধ নহে। ইহার পর প্রবুদ্ধ নামক তৃতীয় প্রকার প্রমাতা আলোচনার বিষয়। এই সকল আত্মাকে দ্বিপদী বলা চলে, কারণ একদিকে যেমন ইহাদের ভব সংস্কার আছে তেমনি অন্যদিকে ইহাদের উদ্ভব সংস্কারও আছে। এই সকল প্রমাতা ভেদাভেদ দশাতে অবস্থিত। ইহারা একদিকে যেমন জড় ভাবাত্মক ইদন্তা আশ্রয় করে। অন্যদিকে তেমনি চিদ্-ভাবাত্মক অহন্তা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহাদের অনুভূতি "ইহা ও আমি" এই উভয়ের সামানাধিকরণ্য। অর্থাৎ ইহারা অহংভাবে আরোপণ করিয়া অনুভবের ভেদাংশ ডুবাইয়া 'ইদং অহং'রূপে বোধ প্রাপ্ত হয়। ইহারা নিজের শরীর সদৃশ বিশ্বকে দেখিয়া থাকে, যাহাতে ভেদ থাকে অভেদও থাকে। যোগিগণ এইটিকে ঈশ্বরের অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই হইল প্রবুদ্ধ আত্মার বিবরণ।

প্রবুদ্ধ অবস্থা হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা পর্য্যন্ত আত্মার উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু প্রবুদ্ধ দশা হইতে সুপ্রবুদ্ধ দশাতে যাইতে হইলে একটি মধ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রগতি লাভ করিতে হয়। অভেদ জ্ঞান অথবা কৈবল্য "উদ্‌ভব" নামে পরিচিত। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ

করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট ইদংরূপী প্রকৃতির বিষয়ীভূত জ্ঞেয় পদার্থ অহংরূপী আন্তরিক পদে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এই নিমগ্ন ভাবের প্রকৃতিকে "নিমেষ" বলা হয়। বিমর্শশক্তি দ্বারা ইহা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থাটি সদাশিবের স্থিতির অনুরূপ— ইহাতে অহংভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত অস্ফুট ইদং ভাব বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থাটি স্থায়ী নহে। যখন ইহা আবির্ভূত হয় তখন নিজের স্বরূপভূত প্রকাশে একবার মগ্ন এবং তাহার পর উন্মগ্ন, এই দুইটি রূপেরই অনুভব হইয়া থাকে। মগ্ন রূপটিকে বলা হয় নিমেষ এবং উন্মগ্ন রূপটিকে বলা হয় উন্মেষ। যেমন সমুদ্রে কখন তরঙ্গাদি উত্থিত হয় আবার কখন উহারা লীন হইয়া যায়, কিন্তু উভয় অবস্থাতে সমুদ্র সমুদ্রই থাকে, ঠিক সেই প্রকার শিবাদি বিশ্ব প্রকাশাত্মক রূপেই প্রকাশ রূপে উন্মীলিত হয়। আবার প্রকাশের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থাটি প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ এই উভয় অবস্থার অন্তরালবর্ত্তী। ইহাকে সমনা অবস্থা বলা হইয়া থাকে।

উন্মনা দ্বারা যখন স্বরূপে অবস্থিতি হয় তখন ঐ স্থিতিকেই উন্মনা নামে নির্দ্দেশ করা হয়। যখন উন্মনা দ্বারা পূর্ণত্ব সিদ্ধি অবিচলিত হয়, তখন যোগী সিদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। এই অবস্থায় স্থিত হইলে মনের কোন ক্রিয়া থাকে না। অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য ইহাকে কদাপি স্পর্শ করে না।

যোগী যখন 'সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁহার

ইচ্ছামাত্র অভীষ্ট বিভূতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাকেই ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়া থাকে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে যোগী ইচ্ছা করলেই উহা ইচ্ছাশক্তি রূপ ধারণ করে না। কারণ মনকে অতিক্রম না করিতে পারিলে আত্মার জাগরণ পূর্ণ হয় না এবং আত্মা পূর্ণ ভাবে জাগিয়া না উঠিলে অর্থাৎ মন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হইলে তাহার ইচ্ছা ইচ্ছাশক্তি রূপ ধারণ করে না।

এই যে সিদ্ধির কথা বলা হইল ইহা নানা প্রকার এবং ইহার আবির্ভাবও বিভিন্ন উপায়ে হইয়া থাকে। এই এই সকল সিদ্ধিকে অপর সিদ্ধি ও পরসিদ্ধি এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা সম্ভবপর। অপরসিদ্ধি নিম্নস্তরের সিদ্ধি এবং পরসিদ্ধি ঊর্দ্ধস্তরের সিদ্ধি।

আত্মসিদ্ধি গুরু লাভের নামান্তর এবং দ্বিতীয় সিদ্ধি শিবত্বের স্বরূপ। এই দুইটিকে মহাসিদ্ধি বলা যেতে পারে। সূর্য্য প্রভৃতি যে কোন বস্তুকে আত্মারূপে দৃঢ় ভাবনা করিতে পারিলে উহার জগৎ প্রকাশনাদি কর্ম্ম যাহা নিত্যসিদ্ধ তাহা চিনিতে পারা যায়। ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)। যখন এই প্রত্যভিজ্ঞা অত্যন্ত দৃঢ় হয় তখন ইহা অর্থকারিরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ ইহা কার্য্যে পরিণত হয়। তখন যোগী সূর্য্যাদি রূপ না হইয়াও স্বয়ং সূর্য্যাদি বস্তুর

রূপ ধারণ করে। বিমর্শ অথবা জ্ঞান দুর্ব্বল হইলে ভিন্নরূপে স্থিতি হয়। কিন্তু ঐ বিমর্শজ্ঞান প্রবল হইলে ভেদ ও ভ্রমের সংস্কার থাকে না। যোগী তখন স্বয়ং বিশ্বাত্মক হইয়া যায় বলিয়া যাবতীয় সিদ্ধি নিত্যসিদ্ধিরূপে প্রকাশ পায়। এবং ইহা দৃঢ় হইলে কেবল ভাবমাত্র থাকে না। কিন্তু আপন আপন কার্য্যসাধনে সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যোগীকে সর্ব্ব অবস্থাতেই নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশাত্মক যে বিশ্বরূপী স্বরূপ তাহা হইতে অবিচলিত থাকা আবশ্যক।

যে দেবতা যে কার্য্যসাধন করে সেই কার্য্যসাধন যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই দেবতার অহংকার ধারণ করিতে পারিলে ক্ষণমাত্রে সেই কার্য্য সাধন সম্ভবপর হয়।

পৃথিবীর লক্ষণ ধারণ, জলের লক্ষণ সংগ্রহ, তেজের লক্ষণ পাক, বায়ুর লক্ষণ ব্যূহ এবং আকাশের লক্ষণ অপ্রতিঘাত। যোগী পৃথিব্যাদি যে ভূতকে আত্মরূপে অনুসন্ধান করে সেই ভূতের কর্ম্মসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ঠিক এই প্রকার তন্মাত্রা, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অস্মিতা, বুদ্ধি, অব্যক্ত ও পুরুষ—ইহাতে স্মৃতিশক্তি ধারণ করিতে পারিলে অনুরূপ কর্ম্মসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার রাগ, নিয়তি, কাল, বিদ্যা, কলা ও মায়াতে চিৎশক্তি ধারণা সম্ভবপর। পক্ষান্তরে শুদ্ধবিদ্যা বা সরস্বতী, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, ইহাদের উপরও চিৎশক্তি ধারণা সম্ভবপর। ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই তদনুরূপ সিদ্ধি আবির্ভূত হয়।

আচার্য্যগণ বলেন যে শুকদেব, বামদেব, কৃষ্ণ, দধীচি, বৈন্য, ইহাদিগের যে বিশ্বাত্মক ভাব পুরাণ ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আবির্ভূত হয়। ইহার পর মহাসিদ্ধির কথা মনে রাখিতে হইবে। মহাশক্তির বা পরাশক্তির বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক। এই শক্তি কোটী কোটী কালাগ্নির দীপ্তি লইয়া ষড়ধ্বাকে দগ্ধ করিতেছেন। নিরন্তর ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যখন তৃপ্তি অথবা আপ্লাবন রূপ সিদ্ধির উদয় হয় তখন অমৃতের লহরী বৃষ্টির ন্যায় সমস্ত অধ্বাকে প্লাবিত করে। এই অনবিচ্ছিন্ন সুধা সমুদ্রের কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। এই দাহ ও প্লাবনের দ্বারা "সকলীকরণ" রূপ ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়। যতটা অধ্বা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শোধিত হয় নিঃশেষে ততটা জগৎ অনুগ্রহের ভাজন হইয়া থাকে। এই যে শুদ্ধির কথা বলা হইল ইহা দেহাত্মকরূপে সংক্ষিপ্ত ষডধ্বার শুদ্ধি নহে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের শুদ্ধি। সকল আচার্য্যই বিশ্বশরীর। কোন নির্দ্দিষ্ট দেহে দেহীরূপে যে অভিমান তাহা আচার্য্যত্ব নহে। সেইজন্য বিশ্বকে নিজের শরীর রূপে পরিণত করিয়া বিশ্বের সাধন করা আবশ্যক। অতএব প্রকাশের সঙ্গে এই দেহের অভেদ দর্শনকারী যে স্বরূপ অবস্থিতি তাহাই যাবতীয় অধ্বার দাহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা অপর কিছু নহে, বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপী প্রকাশের সঙ্গে তাদাত্ম্য। পূর্ব্বে যে আপ্লাবনের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই বিমর্শের নামান্তর। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে "প্রকাশাস্য বিমর্শঘনতা প্রত্যভিজ্ঞান দার্ঢ্যাৎ" পরমানন্দ আবির্ভাব। এই ব্যাপারটি

কে প্রাচীন শাক্তগণ সকলীকরণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের আবির্ভাবের নামান্তর। বাস্তবিক পক্ষে প্রকাশরূপী চৈতন্য যখন বিমর্শ শক্তির প্রভাবে ঘনীভূত হয় তখন দৃঢ় প্রত্যভিজ্ঞার উদয় বশতঃ এই আনন্দ প্রকট হইয়া থাকে। ইহারই নাম আত্মাসিদ্ধি। ইহা গুরু প্রাপ্তির নামান্তর।

মনে রাখিতে হইবে এই অবস্থাতেও পূর্ণ খ্যাতির উদয় হয় না। তাই ইহাও অপূর্ণ খ্যাতির অন্তর্গত। অপূর্ণখ্যাতি স্থায়ী হয় না। কিন্তু যখন স্থায়িত্বের উদয় হয় তখন ইহাকে দৃঢ় ভাবে আশ্রয় করিয়া অপূর্ণ খ্যাতিকে ক্ষয় করিতে হয়। প্রতিক্ষণে অনুসন্ধানকে দৃঢ় করিয়া এই ক্ষয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। যোগী এইরূপে পূর্ণ খ্যাতি উন্মীলন করিতে করিতে ইচ্ছা অনুসারে ভুবন সকল সৃষ্টি করিতে থাকেন এবং রক্ষা প্রভৃতি সকল কৃত্যই সম্পাদন করেন, অর্থাৎ যোগী তখন পঞ্চকৃত্য করিতে সমর্থ হন।

পূর্ণত্ব লাভ ও নিত্যলীলা আলোচনা করিতে হইলে তিনটি দিক হইতে বিচার করা আবশ্যক। একদিকে মহাপ্রকাশ যিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া পঞ্চকৃত্যময়রূপে সর্ব্বদা নিত্যলীলা পরায়ণ। অন্য দিকে চিদাকাশ রহিয়াছে, সেখানে আত্মা চিতি শক্তি দ্বারা অভিনয় করেন। অপর দিকে প্রেক্ষকরূপে ইন্দ্রিয় সকল বিরাজ করেন। এই স্থানে আমরা কর্ত্তা, দ্রষ্টা ও নাট্য-গৃহের সন্ধান পাইলাম। এই লীলার মুল হ্লাদিনী শক্তি। রসাস্বাদন করেন ইনি এবং করানও ইনি।

(৩)

গুহ্যরাজ্যে জাগরণের ক্রম নানা দিকে নানা প্রস্থানে দেখান হইয়াছে। এইখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পূর্ণ জাগরণের ফলই পূর্ণত্বলাভ। যাহাকে অদ্বৈত শৈবগণ পরম শিব বলিয়া বর্ণনা করেন ইহা সেই অবস্থারই নামান্তর। ইহাই পরাসংবিৎ, ইহা একই সময়ে বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক। স্বরূপ সর্ব্বদাই নিত্য প্রাপ্ত, শক্তিও তাহাই। যে দিকে বিশ্বের ভান নাই সেই দিকটাতে শক্তির এক কলা ব্যতীত পূর্ণ সঙ্কোচ অবস্থা রহিয়াছে। এক কলা শক্তি বিশ্বাতীত অবস্থাতেও থাকে, না থাকিলে বিশ্বাতীত অক্ষর স্বরূপ জগতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই কলা থাকা সত্ত্বেও আত্মাকে নিষ্কল বলা হয়। উহা না থাকিলে শিবের শিবত্ব থাকিতে পারে না। এই এক কলাই অমাকলার নামান্তর। ইহাকে ঋষিগণ অমৃত কলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাকী পনর কলার সংকোচ ও প্রসার হইয়া থাকে। বিশ্বাত্মক অবস্থাতে প্রসার বা বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

ইহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। শক্তি বা কলা চিতি শক্তিরই নামান্তর। ইহার বিকাশ কি প্রকারে হয় তাহা আলোচ্য। শক্তির তিনটি অবস্থার কথা মনে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি সুপ্তাবস্থা। একটি ক্রমিক জাগরণের অবস্থা, এবং একটি নিত্য পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা। পূর্ণ

জাগ্রতেরও ক্রম আছে। তদ্রূপ শক্তির জাগরণ বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে ইহা অচিৎ অবস্থা হইতে চিন্ময় রূপে উত্থিত হয়। শক্তির যেটি কৃশ দশা তাহাতে আচার্য্যগণ বিশ্বের আস্বাদন করেন না। যদিও বিশ্ব অভেদ সম্বন্ধে তাহাতেই আছে ইহা সত্য, তথাপি যাহা বলা হইল তাহাও সত্য। বিশ্ব তাঁহাতে তিনি হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে নিজেকে আস্বাদন করিতেছেন না। তবে ত অণুভাব বা সংকোচের উদয় হইয়াছে। তাই সুপ্ত অবস্থা একটি ঘেরের অবস্থা। এই ঘের বা আবরণটি মহামায়ার স্বরূপ। অণু ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উহা ব্যাপ্ত হয়। এইজন্য উহা শূন্য, উহাকেই শাস্ত্রে তিরোধান বলিয়া থাকে। এইজন্য অস্ফুট বিগ্রহ তাহাতেও থাকে। স্ফুট বিগ্রহ অবস্থায় কঞ্চুকের সহিত যোগ হয়। পরে কলা হইতে প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। এদিকে পুরুষ কর্ম্মমলযুক্ত হইয়া পড়িল। ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির উদয় হইল, চিত্তের আবির্ভাব হইল, তাহার ফলে দেহ প্রকট হইল। তখন পুরুষ কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিলেন। জগৎ ও ভোগ্যরূপে পরিণত হইল। এই প্রকার সংকোচের ক্রম বৃদ্ধির ফলে প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতারূপ বিভক্ত দশার উদয় হইল।

সাধারণ মানুষের স্তরে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এটা ভেদময় জ্ঞানের রাজ্য। শাক্তগণ বিশ্বকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কয়েকটি অঙ্গ দেখিতে পাইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি গ্রাহ্য,

দ্বিতীয়টি গ্রহণ ও তৃতীয়টি গ্রাহক। কিন্তু তাঁহারা এমন এক প্রকার গ্রাহকের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহাতে গ্রাহ্য ও গ্রহণ-জনিত ক্ষোভ নাই, অথচ যিনি গ্রহণ ফলের অধিকারী। ইহা সত্য। এই জগতের প্রথম অঙ্কুর ইহাই এবং বলিতে গেলে ইহাই সংবিৎ বা প্রমা অবস্থা। সমস্ত জগৎ ইহারই গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সবই ইহার অন্তর্গত। সৃষ্টি প্রসঙ্গে প্রথমে জ্ঞাতার আবির্ভাব হয়, তাহার পরে জ্ঞানের এবং সকলের শেষে জ্ঞেয়ের। এইগুলি শক্তির দশা জানিতে হইবে। এখানে শিব শক্তিমানরূপে বিদ্যমান নহেন, কিন্তু শক্তিরূপে, এই শক্তির তিনটি রূপ আছে। তদনুসারে একটি পরাশক্তি, দ্বিতীয়টি পরাপরাশক্তি ও তৃতীয়টি অপরাশক্তি। এই তিনটি ব্যতীত মাতৃসদ্ভাব নামে একটি সত্তা রহিয়াছে। এইটি চতুর্দ্দল চক্রের রহস্য।

পূর্ণতার তিরোধান হইলে এই দশার উদয় হয়। ইহা শক্তি দশা নামে পরিচিত। ইহা হইতে সংসার অবস্থার উদয় হয়। শক্তির দশাটি অবিভক্ত। ইহাতে পরা, পরাপরা ও অপরা তিন শক্তিই এক সঙ্গে রহিয়াছে। এখনও এই সকল শক্তি দেবীরূপ ধারণ করে নাই। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মাতৃ-সদ্ভাবের তাৎপর্য্য। এইখানে এই অবস্থায় সকল প্রকার অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ তাহাদের মূলে ক্ষোভ নাই, তবে এখানেও অপূর্ণতা আছে, এটি একটি অদ্ভুত রাজ্য।

পূর্ণ সত্তা হইতে অবতরণ—ইহারই নাম তিরোধান। শাক্তগণ

এই পরম প্রকাশময় পূর্ণ সত্তাকে "ভাসা" নামে বর্ণনা করেন এবং এই শক্তিময় অবস্থাকে অনাখ্যা নাম দিয়া ব্যাখ্যা করেন। ভাসা হইতে অনাখ্যায় অবতরণ, ইহাই নিগ্রহ বা তিরোধান এবং অনাখ্যা হইতে ভাসাতে আরোহণ, ইহারই নাম অনুগ্রহ। তিরোধানের ফলে চতুর্দ্দল কমলের আবির্ভাব হয় ও তাহা হইতে ক্রমশঃ ষোড়শদল পর্য্যন্ত বিকসিত হয়, পক্ষান্তরে অনুগ্রহের ফলে ষোড়শদল হইতে চতুর্দ্দল পর্য্যন্ত গতি হয় এবং তাহার পর অনাখ্যা আশ্রয়ে "ভাসাতে" স্থিতি হয়।

ভাসাতে আত্মা অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অব্যয়স্বরূপ। ইহাই পুরুষ। অনাখ্যে চতুর্দ্দল প্রকৃতিতে স্থিতি। ইহা অবিভক্ত হইলেও বিভাজ্য। প্রমাতা স্থানে অষ্টদল কমল ও আমিতা-রূপের প্রকাশ। ইহা বিভাজ্য ও সত্ত্ব প্রধান। প্রমাণ ভূমিতে দ্বাদশ দল কমল। ইহা মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ক্ষেত্র। ইহা রজঃপ্রধান। প্রমেয় ভূমিতে ষোড়শ দল কমল, ইহা তন্মাত্রা ও ভূতের ক্ষেত্র, ইহা তমঃপ্রধান।

অনুগ্রহ শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ প্রমেয় হইতে প্রমাণ, প্রমাণ হইতে প্রমাতা, প্রমাতা হইতে অনাখ্যা এবং অনাখ্যা হইতে পূর্ণ বা ভাসাতে প্রবেশ হয়।

পূর্ণ ও ভাসাতে সমগ্র বিশ্ব অভেদে বিদ্যমান থাকে। তিরোধান কালে তাহা পৃথক্ ভাবে স্ফুরিত হয়। ইহারই নামান্তর প্রকৃতি অথবা "শক্তি-চক্র।" ইহাই এক প্রকার পুরুষ হইতে প্রকৃতির আবির্ভাব অথবা ব্রহ্ম হইতে মায়ার আবির্ভাব

বলা যাইতে পারে। তিরোধান শব্দের অর্থ আত্ম-সংকোচ অথবা কালচক্রের আবির্ভাব। ইহার মধ্যে প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ পক্ষ। অমাবস্যাটি পূর্ণ সংকোচের প্রতীক। এই অবস্থায় চিৎকলা সকলের সম্পূর্ণ আকুঞ্চন ঘটিয়া থাকে—একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট থাকে, ইহারই নাম "অমা"।

এইখানে একটি কথা বিবেচনার যোগ্য মনে হয়। পূর্ণ হইতে যে অনাখ্যার আবির্ভাব হয়, ইহার প্রণালীটি বিবর্ত্ত, অনাখ্যা হইতে যে ত্রিপুটীর আবির্ভাব ইহার প্রণালীটি পরিণাম। ইহার পর আরম্ভ ক্রিয়ার অবসর হয়। জাগরণ হইতেই অনুগ্রহের উদয় হয়। ইহার পর শাক্ত স্রোতের বর্ষণ হয়। এই প্রক্রিয়াটি চলে অনাখ্যা পর্য্যন্ত। তাহার পর অনাখ্যা হইতে পূর্ণ অথবা ভাসায় প্রবেশ পরম অনুগ্রহের স্বরূপ। যেমন আরম্ভবাদ অবরোহ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, তেমনি আণব ব্যাপার আরোহের পর বুঝিতে হইবে। আরোহ ক্রমে প্রথমে থাকে নিজের চেষ্টা। ইহার নাম "আণব উপায়", তাহার পর শাক্তস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, লক্ষ্য হইল শক্তি অথবা অনাখ্যা। অনাখ্যায় গমন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়। কারণ নিজ হইতে পূর্ণে বা ভাসাতে যাওয়া যায় না। তখন পূর্ণ টানিয়া লন, তাহার ফলে হয় পূর্ণত্ব লাভ। অনাখ্যা হইতে ভাসায় তখনি যাওয়া সম্ভব হয় যখন আত্মা নিজে হইতে ধরা দেন। অনাখ্যা পর্য্যন্ত যায় অনুগ্রহের ফলে ঊর্দ্ধ স্রোতের টানে। কিন্তু

ঊর্দ্ধ স্রোতেও শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় না। সেই তুঙ্গ শিখরে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তখন তিনি টানিয়া লন।

মহাশক্তি মা সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যান এবং এই উপলক্ষ্যে আত্মার রূপান্তর সাধন করেন। তিনি শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। ইহা বিশ্বের ঊর্দ্ধতম স্থান। তবে ইহা বিষয়ী বিশ্ব। ইহার পর পূর্ণের মহাকৃপায় বিশ্বাতীত অবস্থার প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ণত্ব লাভ হয়।

অতএব অনুগ্রহের ধারা হইল শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমা হইল পঞ্চদশী। আরোহ ক্রমে উহাই অনাখ্যা। অবরোহ কালে শিব ছিলেন শক্তিরূপ, আরোহ কালে শক্তি হন শিবরূপ। ঐখানেই শক্তি শিবরূপ ধারণ করেন। এইজন্য শক্তিযুক্ত শিবের প্রকাশ ইহাই যুগলপদ্ম। তাই পঞ্চদশী যুক্ত। তারপর ষোড়শী অর্থাৎ "অমা", এটি যুক্ত নহে, একা। ইহার পর অবস্থা হইল পরা।

অনাখ্যার পরে ভাসা। ইহার মধ্যে আছে অনন্ত ব্যবধান। তিরোভাব বশতঃ এই ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার অনুগ্রহের উদয় হইলে এই ব্যবধান কাটিয়া যাইবে। তিরোভাবের ফলে কালরাজ্যে প্রবেশ হয়, সুতরাং এই ফাঁকটি যমুনা, অথবা কালনদী কিম্বা বিরজা। বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় বলিতে গেলে পূর্ণটি হইল নিত্য বৃন্দাবন বা নিত্যলীলা ভূমি, যমুনা অথবা কালনদী পার হওয়াই পারে যাওয়া, নাবিক একজন মাত্র, তিনিই পূর্ণ।

আত্মার জাগরণের একটি ক্রম আছে। আত্মা এখন মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। এইজন্য তাহার আত্মঃবিমর্শ নাই, ইহারই প্রভাবে পিণ্ডমাত্রে তাহার অহংন্তা রক্ষিত হয়। ইহারই নাম দেহাভিমান। ইহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেইজন্য সে বিশ্ব শরীর বলিয়া নিজেকে বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার জাগরণও ঘটিতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিশুদ্ধ আত্মা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বরূপ এবং অশুদ্ধ আত্মা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহাকে আমরা গ্রাহক বলিয়া বর্ণনা করি। বিশুদ্ধ আত্মাই বস্তুতঃ পরমশিব, সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই শরীর। অনাশ্রিত শিব হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী তত্ত্ব পর্য্যন্ত সবই তাঁহার শরীর। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও গ্রাহক চৈতন্য এক প্রকার নহে। শুদ্ধ চৈতন্যরূপী আত্মা কোন নির্দ্দিষ্ট রূপে বিশিষ্ট গ্রাহ্যের প্রতি উন্মুখ হন না। যে ঐ প্রকারে উন্মুখ হয় তাহারই নাম গ্রাহক। উহা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য। ঐ গ্রাহ্যদ্বারাই তাহার চৈতন্য বা প্রকাশ অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ভান কি প্রকার? নির্দ্দিষ্ট বিশেষ রূপে ভান উহাতে হয় না। পরন্তু ভান হয় সামান্য সত্তায়। এই সামান্যের অনুসন্ধানই তাহার স্বভাব। সর্ব্বত্র অনুগত এক অখণ্ড সত্তার অনুসন্ধানই তাহার স্বভাব। যে কোন আত্মা নিজের গ্রাহকত্ব নিবন্ধন নিয়ত দর্শনাদি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে চৈতন্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার শরীর রূপে গণ্য হয়।

শুদ্ধ আত্মা বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন আত্মার অস্মিতা বিষয় লইয়া খেলা করে, কাহারও দেহকে আশ্রয় করিয়া, অপর কাহারও ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ প্রাণ অথবা শূন্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। শূন্যই সুষুপ্তিরূপী মায়া। অহং অভিমান হইতে হইলে যে দেহেই হইতে হইবে অথবা দৃশ্যেই হইতে হইবে তেমন কোন কথা নাই। দেহবাহ্য বিষয়ে অস্মিতা হয়, পক্ষান্তরে অদৃশ্য হইলে তাহাতেও অহং অভিমান হইতে পারে। আসল কথা এই, অহং অভিমান ও মায়া। এই অহং অভিমান চিতিরই অথবা সংবিৎএরই হয়, গ্রাহকের হয় না। উহা কোন কোন পদে ধারণ করা হয়। যদি উহা ছয় অধ্বাতেই ধারণ করা যায় তাহা হইলে শিবাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল বস্তুকে নিত্য শুদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা অনুসন্ধান করা যায়। তাহা হইলে সাধারণ আত্মাও নিজেকে বিশ্বরূপ বলিয়া বোধ করিতে পারে।

আর এক কথা। যাহাতে চিতির দৃঢ় অভিনিবেশ অথবা অস্মিতা থাকে, ইচ্ছামাত্র তাহাতে ক্রিয়া উৎপাদন করা যায়। অস্মিতা অহং আকার অভিনিবেশ মাত্র। একমাত্র শিবের অস্মিতা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, কারণ শিব গ্রাহক নহেন, অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন প্রকাশ নহেন।

এই যে অহংতা ইহা বিন্দু হইতে শরীর পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বিন্দু হইল স্বরস বাহিনী সামান্যভূতা সূক্ষ্মা অহং প্রতীতি, যাহা গ্রাহক, গ্রহণ ও গ্রাহ্যাদি প্রতীতি বিশেষের পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রাণ হইল সেই সত্তা বা অণুর নাম

যাহা অভিমান অধ্যবসায় প্রভৃতি অন্তঃকরণের ক্ষোভক। শক্তি হইল বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর রূপে প্রসিদ্ধ। বিন্দু হইতে শরীর পর্য্যন্ত ছয়টিকে আবেষ্টন করিয়া কম্পিত করে যে অহন্তা তাহারই ধারণা চাই। ভাবনা দ্বারা এই অহন্তার বিকাশ হয়। ইহারই নাম কর্ত্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব, স্বাতন্ত্র্য, চিৎস্বরূপতা ইত্যাদি। সিদ্ধিমাত্রই অহন্তাময়, সেইজন্য দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া আবশ্যক।

(৪)

সুপ্ত প্রমাতার প্রতীতি কিরূপ? এ মায়া মোহিত। গ্রাহক চিদাত্মক এবং গ্রাহ্য অচিদাত্মক ও উহা হইতে ভিন্ন রূপে প্রতীত। যদিও সমগ্র বিশ্বভুবনাবলী পূর্ণের বা প্রকাশের অন্তরে স্থিত, তথাপি সুপ্ত আত্মা মনে করে যে ইহা তাহা হইতে বাহ্য। এই সকল আত্মা ভবী নামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

জাগ্রত কল্প প্রমাতার প্রতীতি কি প্রকার? ইহার নামান্তর ভবপদী। শুদ্ধ বিদ্যারূপী প্রমাতা এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত প্রমাতা ইহারই অন্তর্গত। ইহারা ঠিক সুপ্ত নহে অথচ ঠিক জাগ্রতও নহে। সুপ্ত নহে, কারণ ইহাদের ভব বা সংসার নাই, যেহেতু ইহাদের ভেদজ্ঞান নাই, অর্থাৎ অভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন প্রতীতি নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহাদের অবস্থা উদ্‌ভব। তবে ভব অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না থাকিলেও উহার সংস্কার ইহাদের চিত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে, কারণ অন্তঃ সংকল্প প্রভৃতি আকারে ভিন্নবৎ প্রতীতি শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে অথবা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলে হইতে পারে। এই অবস্থায় অবিবেক থাকে। ইহার পর

বিবেকখ্যাতির উদয় হয় ও পরে শুদ্ধ সত্তার আবির্ভাব হয়। এই অবস্থাটি ঠিক স্বপ্নের ন্যায়। সুপ্তি নাই বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক জাগরণও হয় নাই। ঠিক ঠিক জাগরণ হইলে ভেদের সংস্কার থাকা সম্ভবপর হইত না। এই সব আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ কোন কোন দৃষ্টি অনুসারে মুক্ত পুরুষ রূপে পরিগণিত হইলেও ইহারা প্রকৃত মুক্ত পুরুষ নহে। তন্ত্র শাস্ত্রে ইহাদিগকে রুদ্রাণু রূপে বর্ণনা করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহারাও পশু। কর্ম্ম-সংস্কার রহিত হইলেও সংবিৎ শ্রবণে ইহাদের অধিকার নাই।

ইহার পর জাগ্রত অথবা প্রবুদ্ধ প্রমাতার অনুভূতির কথা বলা যাইতেছে। এই সকল আত্মাতে ভেদের এবং অভেদের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। এই সকল আত্মা জড় বস্তুকে ইদং রূপে অনুভব করে এবং পক্ষান্তরে অহং বস্তুর প্রতীতিও অহংরূপে থাকে। সামানাধিকরণ্য বশতঃ অভেদের আরোপ হয় বলিয়া ভেদাংশ ঢাকা পড়িয়া যায় এবং 'ইদং-অহং'রূপ অনুভবের উদয় হয়। ইহাদের অনুভবে সমগ্র বিশ্ব নিজের শরীর রূপে প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় দুইটি অনুভব যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। এইটিকে ঈশ্বর অবস্থা বলে।

সুপ্রবুদ্ধ কল্প ও সুপ্রবুদ্ধ প্রমাতার অনুভব বলা যাইতেছে। এই অবস্থায় ইদং প্রতীতির বিষয়ীভূত জ্ঞেয় পদার্থ অহং-রূপী স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ পায়। এইটি নিমেষরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই সকল আত্মা অভেদ জ্ঞান অথবা কৈবল্য প্রাপ্তি বশতঃ উদ্‌ভবী রূপে বর্ণিত হয়। ইহারা অহং-

রূপ স্বরূপে মগ্ন থাকে। এই অবস্থাটি অহংভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত অস্ফুট ইদংভাবের দশা, এইটিকে সদাশিব অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহাও আত্মার পূর্ণস্থিতি নহে। ইহার পর পূর্ণস্থিতির উদয় হয়, কিন্তু তাহা অস্থায়ী। এই অবস্থায় "নিমেষ ও উন্মেষ" উভয়ই থাকে। সমুদ্রে তরঙ্গাদির যেমন নিমেষ উন্মেষ দুইই থাকে, ইহাও কতকটা সেই প্রকার। প্রকাশ সর্ব্বদাই থাকে, তবে শিবাদি বিশ্বের ভান কখন থাকে, কখন থাকে না। যখন ভান থাকে তখন প্রকাশাত্মক রূপেই তাহার উন্মেষ হয়। যখন ভান থাকে না তখনও প্রকাশ স্বরূপেই তাহার নিমেষ হয়।

ইহার পর প্রকৃত পূর্ণত্বের আবির্ভাব হয়। ইহাই স্থায়ী অবস্থা। পূর্ব্বে যে পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাহাতে প্রকাশ ও নিমেষের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন তাহা নাই। ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বে মন ছিল বলিয়া নিমেষ ও উন্মেষ ঘটিত। এখনকার অবস্থা ঠিক উন্মনা। উন্মনা বলিয়া পূর্ণাত্মার সিদ্ধি অচল। ইহারই নাম সিদ্ধ সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা। এই প্রকার যোগীর ইচ্ছামাত্রে অভিমত বিভূতির আবির্ভাব হয়। ইহাই আত্মার পূর্ণ জাগরণের অবস্থা।

(৫)

এবার বিভূতি অথবা সিদ্ধির বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সিদ্ধি নানা প্রকার হইতে পারে। কোন কোন সিদ্ধি অর্থমূলক। এইগুলি নিম্নস্তরের সিদ্ধি অথবা অপরা সিদ্ধি।

কোন কোন সিদ্ধি তত্ত্বমূলক। এইগুলি উচ্চ স্তরের সিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি। প্রত্যেকটি অর্থের এক একটি কর্ম্ম আছে। ইহাকে cosmic function বলা যাইতে পারে। নিত্য সিদ্ধ যোগী যখন যে অর্থে আত্মভাবনা করে তখন সে সেই অর্থরূপে স্বয়ংই অবস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বজ্র, সমুদ্র, পর্ব্বত ইত্যাদি প্রত্যেকের যে অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে যোগী তাহা এইক্ষণে প্রাপ্ত হইতে পারে। যে দেবতা যে অর্থ বা প্রয়োজন সম্পাদন করে, ইচ্ছা করিলে সেই অর্থ সেই দেবতাতে অহং অভিমান ধারণ করিতে পারিলে ক্ষণমধ্যে স্বয়ংই ফুটিয়া উঠে। এই প্রকার পৃথিবী হইতে শিবত্ব পর্য্যন্ত অহংভাবে অভিনিবেশ নিবন্ধন যোগী তৎ তৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মায়া পর্য্যন্ত যে যে সিদ্ধির উদয় হয়, তাহার নাম গুহান্ত সিদ্ধি। এইগুলি অপরাসিদ্ধি অর্থাৎ নিম্নস্তরের সিদ্ধি। সরস্বতী বা শুদ্ধবিদ্যাদি সিদ্ধি পরাসিদ্ধি। ইহা উচ্চস্তরের সিদ্ধি। ইহার পর সর্ব্বসিদ্ধির ঊর্দ্ধে দুইটি মহাসিদ্ধি রহিয়াছে।

প্রথম মহাসিদ্ধিটি হইল সকলীকরণ। কালাগ্নি সদৃশ তীব্র জ্বালা দ্বারা ছয়টি অধ্বরূপী পাশ দগ্ধ হয়। তাহার পর অমৃত দ্বারা আপ্লাবন ঘটে। তখন ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। এই অবস্থায় শোধিত সমগ্র অধ্বার অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের গুরুপদে বরণ হয়। তিনি জগদ্গুরু, তিনি সমস্ত বিশ্বের অনুগ্রাহক। ইহাও কিন্তু অপূর্ণখ্যাতি। ইহার পর যেটি দ্বিতীয় মহাসিদ্ধি

তাহাই পূর্ণ খ্যাতি অর্থাৎ পরম শিবত্ব লাভ। এই অবস্থায় তাঁহার স্বীয় ইচ্ছানুসারে ভুবনাদির সৃষ্টির অধিকার জন্মে। পরম শিবের পঞ্চকৃত্যকারিত্ব সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। মনে রাখিতে হইবে মুক্ত শিব মাত্রই পরম শিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া পঞ্চকৃত্য সম্পাদনের অধিকারী। কিন্তু অধিকারী হইলেও তাঁহারা কৃত্য সম্পাদন করেন না।

এই স্থানে একটি রহস্যের কথা ইঙ্গিতমাত্রে নিবেদন করিব। সিদ্ধ অবস্থায় এমন একটি স্থিতি আছে যখন যোগী ইচ্ছাশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির দিকে উন্মুখ হন। যতদিন ইচ্ছারূপে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান থাকে ততদিন লক্ষ্য থাকে বাহিরের দিকে। কিন্তু ইচ্ছা অন্তর্ম্মুখ হইলেই ভক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন যোগী ভক্ত কিছুই চান না। একমাত্র তাঁহাকেই চান। কোন প্রয়োজন সিদ্ধি তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, তবুও তাঁহাকে না চাহিয়া পারেন না। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন—'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবৈবাহং' ইত্যাদি। ইহা সেই অবস্থা। ইহাকেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতাতে 'জ্ঞানী ভক্ত' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ ইনি নিত্যযুক্ত এবং একভক্ত।

ক্রিয়া ও তৎপ্রসঙ্গে ঘটনাবলী

শ্রীবিমলপ্রসাদ বসু

১৩ই মার্চ্চ ১৯৬৪ সাল। ক্রিয়ার বিষয় লিখিতে গেলে, সেই সঙ্গে ঘটনাবলীর কথা মনে পড়িয়া যায়। আমি সর্ব্ব-প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ ভাবে প্রণাম জানাই। তৎপরে শ্রীগোপীনাথদাকে ভক্তিপুর্ণ ভাবে প্রণাম করি। কারণ তাঁহার সাহায্য ও অনুপ্রেরণা ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এই সব বিষয়ে জানা অথবা উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর হইত না।

আমার সাধনা ক্ষেত্র হইল, কাশী বিশুদ্ধাশ্রম (কানন)। আন্দাজ ১৯৫৭ সালে আমি প্রথম কাশী বিশুদ্ধ কাননে যাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপীনাথ দাদা আমায় খুবই ভালবাসেন। আমি তাঁহার সহিত এতদিন পত্রের দ্বারা যোগাযোগ করিতাম, উপস্থিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। কাশীর আশ্রম আমার খুবই ভাল লাগিল এবং চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া লইলাম।

প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় ৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসনে ঘেরার মধ্যে বসিয়া জপ করিতাম। বাটীতে আমি প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিতাম, চণ্ডীপাঠের অসুবিধা হইতে লাগিল বলিয়া আমি গোপীনাথ দাদাকে বলিতে তিনি ৺নবমুণ্ডী বেলগাছের বাঁধান বেদীর উপর

বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে অনুমতি দিলেন এবং সেই অবধি তথায় থাকাকালীন আমি প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিতাম। বিশুদ্ধবাণী হইতে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বিজ্ঞান-মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সামনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার জ্ঞানের অগ্নিশিখা আমার হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রজ্জ্বলিত করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি প্রত্যেক শনিবার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানরাশি আমাদের ও অন্যান্য উপস্থিত গুরুভাইএর হৃদয়ের মধ্যে পরিবেশিত করিয়া আমাদের মনে এক স্বর্গীয় আনন্দময় মধুর ভাবের সৃষ্টি করিয়া দিয়া আমাদের জীবন মধুময় করিয়া দিয়াছেন যাহার জন্যে আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

সে দিন ছিল ২৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব। প্রাতঃ ছয়টায় প্রভাতফেরী বাহির হইবে। আশ্রমবাসী ভক্ত, গুরুভাই ভগিনী সকলকে সেই প্রভাত ফেরীতে যোগদান করিতে হইবে। সমস্ত আশ্রম প্রাঙ্গণটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁসর ঘণ্টায় প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত করিয়া শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্তোত্র গানটি গাইতে হইবে। সুতরাং অতি প্রত্যূষে ক্রিয়া সারিতে হইবে। আমিও অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ৺নবমুণ্ডী ঘেরার মধ্যে জপ সারিতে গেলাম। অন্ধকারে ৺নবমুণ্ডীতে গিয়া এই প্রথম ক্রিয়া। সেদিন আর কেহই ছিল না, আমি মাত্র একা ছিলাম। কিছুক্ষণ ক্রিয়া করিবার পর এক ভীতিকর যোগ বিভূতি দেখিয়া আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং ভয়ানক ভয়ও হইল। কিন্তু

শ্রীগোপীনাথদার নিকট জ্ঞানে উদ্‌বুদ্ধ এই মন তখন ধীর স্থির ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শেষ পর্য্যন্ত কি হয় দেখিব। মনে মনে বলিলাম, জয়গুরু! জয়গুরু! জয়গুরু! আমার মন হইতে ভয় দূরীভূত কর। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম সেই ভীতিকর দৃশ্য ৺নবমুণ্ডী বেদীমুলে অদৃশ্য হইল। আমি ক্রিয়া যথারীতি শেষ করিয়া উঠিলাম এবং প্রভাত ফেরীতে যোগদান করিলাম। ইহার পর আমি ভোর পাঁচ ঘটিকায় অন্ধকার থাকিতে থাকিতে এবং রাত্রে সাতটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোনদিনই ভয় পাই নাই। আশ্রমে থাকাকালীন প্রত্যহ ৺নবমুণ্ডীতে ক্রিয়া ও চণ্ডীপাঠ এবং কুমারী প্রসাদ গ্রহণ করিতাম। প্রায়ই রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকার মধ্যে শুইয়া পড়িতাম, কাজেই রাত্রি ৩ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকার মধ্যে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত এবং শুইয়া শুইয়া অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যাবলী দেখিতাম। কিন্তু ভয় করিত না বটে, তবে শেষ পরিণতি কোথায় তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইত। কিন্তু দেখিতাম ইহার শেষ নাই, অনন্ত, নিত্য নূতন।

শ্রীশ্রীগোপালজীউর লীলা

১৯৫৮ সালে জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কাশী আশ্রমে গিয়াছিলাম। তথায় থাকাকালীন এক আশাতীত, তৃপ্তিকর, মনোরঞ্জন ও আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটিল, যাহা আমি জীবনে ভুলিব না। রাত্রি বার ঘটিকায় একদিন আমি হ্যারিকেন হাতে কলতলায় যাইতে ছিলাম, পথিমধ্যে শ্রীগোপাল মন্দির পড়িল।

এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরস্থ শ্রীগোপালজীউর ছোট ছায়ামুর্ত্তি। মন্দিরের রুদ্ধদ্বার হইতে ছায়ামূর্ত্তিটি বাহির হইয়া অতি ধীর পদক্ষেপে একে একে তিনটি সিঁড়ি অতিক্রম করিল এবং এক অপরূপ ভঙ্গিমায় হস্ত দুইটি দুলাইতে দুলাইতে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল এবং কিঞ্চিৎ দুর গিয়া অদৃশ্য হইল। সাধক এবং ভক্তমাত্রেরই তখন মনের কিরূপ অবস্থা হয় ভাবিয়া দেখুন। তারপর হইতে কিছুই ভাল লাগিত না। প্রাণের মধ্যে এক তীব্র জ্বালা অনুভব করিতাম এবং ইহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না।

শ্রীশ্রীগুরু-মহিমা

১৯৫৯ সাল জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কাশী আশ্রমে আসিলাম। শ্রীগোপীনাথদা যথারীতি আশ্রমে আসিলে আমার প্রাণের তীব্র জ্বালা—যাহা আমি খাইতে শুইতে অনুভব করিতাম, কোন আমোদ-প্রমোদেও আমায় তৃপ্তিলাভ করাইতে পারিত না—এরূপ হয় কেন এবং ইহার প্রতিকারের কোন উপায় আছে কিনা এবং ঐ বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তাঁহার প্রাণখোলা আনন্দে আমার সকল কথা শুনিলেন। ইহার প্রতিকারের উপায় কি তাহাও তিনি জানিতেন এবং আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতি অচল অনুরাগ তাহাও তিনি জানিতেন। তাই গোপীনাথদাদা আমাকে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে গুরুরূপে পাইবার নির্দ্দেশ এবং সেই সম্বন্ধে অনেক কিছু শিক্ষা

ও উপদেশও দিলেন। আমিও স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাসে তাহা গ্রহণ করিলাম। তাঁহার প্রত্যেক মূল্যবান্ উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলাম। অকুলের কাণ্ডারী শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদের একদিন করুণা করিলেন। ১৯৫৯ সাল ১৪ই এপ্রেল (শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৫ সাল) শ্রীগোপীনাথ দাদার উপদেশ মত আমরা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শরণ লইলাম। তিনি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে এক রুদ্ধকক্ষে এক এক করিয়া ইষ্টের সন্ধান দিলেন। শ্রীগোপীনাথ দাদার জ্ঞানের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে আমাদের এইরূপ সদ্‌গুরু লাভ সম্ভবপর হইত না। ঐ শুভ ১লা বৈশাখে ভোরের ট্রেনে স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের সহিত কলিকাতায় ভবানীপুর শ্রীশ্রীবিশুদ্ধাশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবের উৎসবে যোগদান করিলাম। তথায় উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ বন্দনা ও পূজা করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। গুরু প্রণামী ও কুমারী সেবার জন্য দক্ষিণা দিয়া এবং কুমারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার সহিত চন্দননগরের বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। যথারীতি সকাল ও সন্ধ্যায় ক্রিয়া সুরু করিতাম। ক্রিয়া অন্তে পূজা ও চণ্ডীপাঠ করিতাম। ইহার পূর্ব্বে আমি প্রায় বিশ্ব বৎসর ধরিয়া চণ্ডীপাঠ করিতাম। আমার প্রাণের সকল জ্বালা নিবৃত্তি হইল। এখানে "গোন্দালপাড়া সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা" হয়—প্রায় বিশ বৎসরের উপর তথায় আমি চণ্ডীপাঠ করিতেছি। কাশীর আশ্রমে ৺নবমুণ্ডীর বেলতলার বেদীমুলে বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিয়াছি। দেখিলাম চণ্ডীর প্রত্যেক শ্লোকটি

স্ফুর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, প্রত্যেক উচ্চারণটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। শরীর রোমাঞ্চিত, মন প্রাণ এক স্বর্গীয় প্রেরণায় অভিভূত, ধীর স্থির ও শান্ত ভাবে পাঠ করিতাম। আপন মনে এবং একাদশ অধ্যায় পাঠ করিবার সময় মনে হইত মা আমার সামনে হাসিমুখে বসিয়াছেন। দুই চক্ষু চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে এবং আমি চণ্ডীপাঠ করিয়া চলিয়াছি। মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল এবং এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিতাম।

জ্যোতিদর্শন কর্ম্মযোগ

সকাল ও সন্ধ্যায় যথারীতি ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ক্রিয়ার প্রভাব একটু একটু করিয়া বিস্তার করিতে লাগিল। কাজেই ক্রিয়ার সময় ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়াই চলিল। ক্রিয়ার দ্বারা অর্জ্জিত তেজোরাশি তিলে তিলে বাড়িয়া একদিন বিকশিত হইয়া উঠিল। ক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত তেজোরাশির মধ্যে দেখিলাম দীপ্তি। এই দীপ্তি অতি তেজোময়, স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় অথচ স্নিগ্ধকর, জ্যোৎস্নাময়ী, তৃপ্তিময়ী ও আনন্দময়ী মার মতন স্নেহময়ী। এই দীপ্তি কখনও স্ফুর্ত্তি হইয়া, কখনও জ্যোতি হইয়া, কখনও আবার এঃ জ্যোতি, নিজের জ্যোতির মধ্যে মিলিত হইয়া, একক রূপে স্থিত হইয়া, এক স্বর্গীয় ভাবের পরিবেশে নিমজ্জিত। তখন তাহার সকল কামনা, বাসনা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সংসার প্রভৃতি চিন্তার অন্তরায় তাহার কাছে শূন্য। এই অব্যক্ত ভাবে নিমজ্জিত হইয়া ক্রিয়া চলিতেছে। এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইতে মোটেই ভাল লাগিত না। অতি

প্রত্যূষের এবং সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে এই স্বর্গীয় ভাবের পরিবেশ হইত। ঊর্দ্ধগত আত্মার ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগত ভাবের আলোচনা, ক্রিয়া বা চিন্তাই তাহার সম্পদ হইয়া উঠিত। পৃথিবীর মানুষ বলিয়া কর্ম্ম করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার মন সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধদিকেই থাকে। এইরূপে ক্রিয়া চলিতে লাগিল অদম্য উৎসাহে এবং স্বর্গীয় ভাবের পরিবেশে এবং আনন্দে।

মাতৃ-আশীর্ব্বাদ, করুণা ও মাতৃ-বিয়োগ

এখানে আমি আমার স্বর্গত স্নেহময়ী জননীর কথা উল্লেখ করিব, যিনি স্বর্গে থাকিয়াও আমার ক্রিয়ার মধ্যে প্রাণশক্তি আনিয়া দিয়াছেন। মা সাধারণতঃ কনিষ্ঠ পুত্রকেই খুব ভালবাসেন, কিন্তু আমি মায়ের মধ্যম পুত্র হইলেও তিনি আমায় খুবই ভাল বাসিতেন। গত বৎসর ১৩৬৯ সাল ফাল্গুন মাস। স্নেহময়ী অসুস্থ, বৃদ্ধামাতার সানন্দ চিত্তের অনুমতি ও স্নেহ-আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কাশী আশ্রমে আসিলাম। এখানে আসিয়া আমি প্রায় এক সপ্তাহ কাল অসুস্থ ছিলাম। তারপর শ্রীগোপীনাথ দাদার অনুমতি লইয়া শ্রীশ্রীবাবার হাসপাতাল দেখিতেছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধা মাতার মহাপ্রয়াণের সময় আগত, কাজেই একদিন মার অসুখের Telegram পাইয়া বাটি রওনা হইলাম। মা আমায় খুঁজিয়াছিলেন ও প্রতীক্ষায়ও ছিলেন। যাহা হউক মা হরিনাম করিতে করিতে এবং কথকশিল্পী সুধারাণীর মধুর কণ্ঠের দিগন্ত মুখরিত হরিনাম বিস্ফারিত নেত্রে শুনিতে শুনিতে মহাপ্রয়াণ

করিলেন। যে মা আমায় হাসিমুখে কাশী পাঠাইয়া ছিলেন, সেই মার অদর্শন হেতু আমি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলাম। তাই মনে হইল মহামায়ার মধ্যে যখন মার অংশ আছে, তখন সেই মহামায়ার করুণা পাইলেই আমার মা পাওয়া হইবে। আমি দুর্গা নাম জপ করিতাম। তারপর হইতে সকাল ও সন্ধ্যায় ক্রিয়ার সময়, হৃদয়ের এই আকুল মর্ম্মান্তিক ভাব এবং বালকের ন্যায় মাকে পাইবার জন্য আকুল আগ্রহ ভাব লইয়া দুর্গানাম জপ করিতাম। ভাবের উচ্ছ্বাসে অশ্রুধারা বহিত। মা দুর্গার করুণা পাইব না, এই মনে করিয়া নিরাশায় বা হতাশায় মনকে দমিতে দিতাম না। সর্ব্বদাই মনে করিতাম, "মা দুর্গা"—এই শক্তির মধ্যে যে আমার মাতৃশক্তি নিহিত আছে। সুতরাং সেই শক্তির মধ্য হইতে আমায় মাতৃশক্তি ও করুণা পাইতেই হইবে। এই ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং আবেগে, দুর্গানাম জপ করিতে বসিয়া দিনের পর দিন রাত যে কাঁদিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। মা যদি জীবিত থাকিতেন এবং আমি যদি নির্জ্জনে বসিয়া, মাকে পাইবার জন্য ঐরূপ আকুল ভাবে কাঁদিতাম তাহা হইলে তাঁহারও সাড়া পাইতাম। সন্তানের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং তিনি নিশ্চয়ই সন্তানের জন্য ছুটিয়া আসিতেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।

শ্রীশ্রীগুরু-কৃপা

মা দুর্গা, তিনি যে মৃন্ময়ী—তাঁহাকে চিন্ময়ী করিতে হইবে—তাঁহার মধ্যে যে আমার মার মাতৃসত্তা আছে—কেন দেখা

পাইব না ? নিশ্চয়ই রাইব ! কিন্তু আমি যে মানুষ ! মানুষের কি দেবী দর্শন হয় ? শ্রীশ্রীগুরুদেব—তিনি ত নারায়ণ ? তাঁহার স্পর্শে দেবী দর্শন হইতে পারেও ? ক্রিয়ার সময় আমার হৃদয় মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে অধিষ্ঠিত করিলাম। শ্রীগুরুপাদস্পর্শে শক্তিমান এই হৃদয় মন্দিরে ক্রিয়া, অতি তীব্র, প্রকট ও তেজস্কর হইয়া উঠিল, আমি দুর্গানাম জপিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় সংকল্প, আবেগ ও উচ্ছ্বাসে চোখে জল ভরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমেই উন্মাদনা ভাবটি প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রেও মা মা রবে কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিতাম—আর ঘুম আসিত না। এই ভাবে শয়নে, স্বপনে মাতৃ অদর্শন হেতু, মৃদু চাপা, গভীর আর্ত্তনাদ এবং মাকে পাইবার জন্য আকুল আগ্রহ বাড়িয়াই চলিল। সর্ব্বদাই মনে মজে দুর্গানাম জপিয়া যাইতাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্পর্শিত এই দেহ একদিন শুদ্ধতা লাভ করিল এবং মারও পাষাণ হিয়া স্পন্দিত হইল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের দর্শন ও গুরুদত্ত ক্রিয়ার শক্তি

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ সাল (১৪ই ফাল্গুন পূর্ণিমা ১৩৭০ সাল) আমার জীবন আকাশে আর এক অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল। আমার ক্রিয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল। অন্যান্য জপ অল্প সারিয়া, দুর্গানাম জপ প্রধান হইয়া উঠিল। মনে হইল দুর্গানাম জপ বেশী না করিলে, আমার আশা পূরণ হইবার সম্ভাবনা

দেখি না। স্মরণ মাত্রই যথারীতি ক্রিয়া সুরু করিলাম। অতি প্রত্যূষে ক্রিয়ার জন্য বসিয়াছি। অন্যান্য জপ সামান্য সারিলাম। এইবার দুর্গা নামজপ সুরু করিব সংকল্প করিয়াছি, এমন সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব স্বয়ং আমার সামনে। ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষুর সামনে ধরিলেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ তীব্র জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল দীপ্তি, যাহার দিকে হঠাৎ তাকাইলে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়। প্রথমে চক্ষু দুইটি ২।৩ বার চাপা দিয়া, তারপর ধীরে ধীরে দেখিলাম। তিনি এই জ্যোতির্ময় দীপ্তির দিকে চাহিয়া ক্রিয়া করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। শ্রীগুরুদত্ত জ্যোতির দিকে চাহিতেই দেহে ও মনে নূতন শক্তি জাগরিত হইল এবং আমায় আরও তেজোময় করিয়া তুলিল। মনে হইল উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষুর মধ্যে দিয়া তেজোরাশি নির্গত হইয়া শ্রীগুরু প্রদত্ত তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া এক মধুর স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি হইল। প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে অতি ধীর স্থির ও একাগ্র মনে প্রায় ৯০ মিনিট ধরিয়া এবং সন্ধ্যায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া ক্রিয়া চলিতে লাগিল। তিন চারি দিন ক্রিয়ার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দেখিতাম। তারপর আমার তেজোরাশি যখন গুরুপ্রদত্ত তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া এক অখণ্ড ভাবে থাকিয়া ক্রিয়া করিতে সুরু করিল তখন আর তাঁহাকে দেখি নাই। ক্রিয়ার সময় আমি এই জগৎ হইতে দূরে এক স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতাম। এইরূপে প্রায় এক সপ্তাহ কাল কাটিয়া গেল। আমার দৃষ্টি জ্যোতির মধ্যে

নিমজ্জিত থাকিয়া মনে হইত যেন আমি জ্যোতিই দেখিতেছি।

হঠাৎ একদিন ক্রিয়া করিতে বসিয়া এবং কিছুক্ষণ ক্রিয়া করিবার পর দেখিলাম মূর্ত্তি। ক্রমশঃ মূর্ত্তিটি প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মূর্ত্তিটি ক্রমে ক্রমে যখন আমার দৃষ্টি পথে পতিত হইল, তখন দেখিয়াই চিনিলাম। দেখিলাম এ যে আমার মাতৃমূর্ত্তি—লাবণ্যময়ী, অনন্তসুন্দরী, করুণাময়ী, জ্যোৎস্নাময়ী, স্নেহময়ী, সদাই হাস্যময়ী—মা অভয়া—মা দুর্গা—আমার দিকে স্মিত এবং অট্ট অট্ট হাসিতে মুখরিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়াছেন। বহু বহু বৎসর ধরিয়া যাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি—সেই মা! মা অভয়া, দুর্গা? মা আমার দৃষ্টি পথে! ক্রিয়া ঠিক ভাবেই চলিতে লাগিল। দুই গণ্ড চক্ষু জলে ভাসিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার দেখিতেছি, মনে হইল ভুল দেখিতেছি। চক্ষের জল মুছিয়া দেখিলাম, আবার দেখিলাম। এইরূপে তিন বার দেখিলাম—না ভুল নয়! সত্যই মা অভয়া দুর্গা। বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। বহু বৎসর ধরিয়া ডাকিয়া সাড়া পাই নাই। তাই অদর্শন হেতু অভিমানে মায়ের কোলে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা স্মিত হাস্যে, স্নেহ বিজড়িত হস্তে আমার মস্তকের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। স্নেহময়ী মায়ের মধুর দৃষ্টি এবং কোমল হস্ত পরশে আমার সকল অভিমান দূর হইল এবং মাকে পাইয়া আমি খুবই আনন্দিত হইলাম। এই অভয়া—মা দুর্গার

মধ্যে যে আমার মা আছেন—কাশী বিশুদ্ধাশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে যাত্রা করিবার প্রক্কালে, যিনি স্নেহ-আশীর্ব্বাদে হাসিমুখে বিদায় দিয়াছিলেন। আমি মাকে পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইলাম তাহা বুঝাইতে পারিব না। একমাত্র মাতৃভক্ত সন্তান ছাড়া ইহা উপলব্ধি করা যায় কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের অসীম করুণায় আমি মহামায়া ও মা দুইই দেখিলাম। তাঁর শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম জানাই।

আজ এই শুভ জন্মোৎসবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শুভ আশীর্ব্বাদ লইয়া এই লিপি শেষ করিলাম। ইহার পরবর্ত্তী বিষয় তিনি যে ভাবে করুণা করিবেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লিখিবার চেষ্টায় রহিলাম। জয়গুরু ! জয়গুরু ! জয়গুরু !

—ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরু-স্মরণে

শ্রীরাজবালা দেবী

শ্রীশ্রীগোপালজীউর মহিমা

'বিশুদ্ধবাণী' অষ্টম খণ্ডে আশ্রমের গোপালের বিষয় লেখা হইয়াছে। ১৩৭২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন বৈকাল ৫টা হবে, বসে নিত্যকার মত গোপাল ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিতেছি। গোপালের হাতে একটা সোনার নাড়ু আছে। সহসা দেখি গোপালের হাতের সেই নাড়ুটি হাঁর মত ফাঁক হ'য়ে গেল। সেই হাঁটি যেন কাঁদ কাঁদ ভাব। গোপাল নাড়ুর দিকে চেয়ে আছে। গোপালের মুখখানি তখন সজীব। তাঁর চোখ তুটি নাকছাবির মত নাকের তুধারে এসে বসে গেল। চোখ যেখানে ছিল সেখানে তুটি বিরাট চোখ হ'য়ে গেল। গোপালের রং ছিল কালো, সেখানে শুধু মুখখানির রং সবুজ হ'য়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা কপালে চন্দন পড়া। গোপাল নাড়ুর সঙ্গে যেন কথা কইছেন ও হাতখানি তুলাচ্ছেন। কখন কখনও নাড়ুকে ধমক দিচ্ছেন এই ভাব। আবার কখন কখনও আদর কচ্ছেন। আদর করিবার সময় দেখিলাম যে গোপালের মুখখানা হাতের নাড়ুর উপর হেঁট হ'য়ে পড়ছে। আবার দেখি গোপাল উত্তর দিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে কি যেন দেখছেন। তাহা দেখে আমিও উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখি

সেদিকে রাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন (যেখানে গোপালের পাদপদ্ম রাখা আছে)। উত্তর দিকে গোপালকে তাকাতে দেখে আমি করুণভাবে বলিলাম—"গোপাল, উত্তর দিকে যখন ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তখন আমার দিকেও একবার ফিরে দেখুন না।" এইভাবে কয়েকবার বলার পর দেখি গোপাল সত্যিই আমার দিকে মুখখানা ঘুরিয়ে চাইলেন। ইহা দেখিয়া তখন আমার যে কি অবস্থা ও আনন্দ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

৺নবমুণ্ডী মার করুণা ও শ্রীশ্রীগুরু দর্শন

আর একদিন দেখি আমি খুব উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখি খুব গভীর ইট দিয়ে গাঁথা খাদ। এপার ওপার দেখা যায় না। আমি যেন সেই খাদে গড়িয়ে নেমে পড়লাম। জায়গাটা বাঁধান থাকায় উপরে উঠার আর কোন উপায় ছিল না। কারণ নীচের থেকে উপরটা খুব খাড়া উঁচু। তখন ভাবিলাম হেঁটে হেঁটে ওপারে গিয়ে যদি ওঠা যায়। এইভাবে ক্রমাগত হাঁটতে লাগিলাম। দেখিলাম ক্রমশঃ জল স্রোতের মত আমার দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে এবং ধীরে ধীরে আমার কোমর পর্য্যন্ত জল হয়ে গেল। তবু পিছন দিকে না গিয়ে সম্মুখের দিকেই চলিতে লাগিলাম। এমন সময় সহসা দেখি কে যেন ছুটে এসে আমার হাতখানা খপ্ করে ধরিলেন এবং এমন ভাবে দ্রুতগতিতে সেখান হ'তে ফিরাইয়া যে পার থেকে আসিতেছিলাম সেই দিকেই লইয়া

গিয়া একেবারে খাদের উপরে নিয়া দাঁড় করাইলেন, তখনও আমার হাত ধরা ছিল। আমাকে বলিলেন—"তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ? এখনই তোমাকে গঙ্গাস্রোতে নিয়া যাইত। বহুদূর থেকে তোমার এ অবস্থা দেখে আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি। তাই তুমি রক্ষে পেয়ে গেলে।" তখন আমি ইহাকে চেয়ে দেখিলাম। দেখেই বুঝিলাম—এতো পরম করুণাময়ী "নবমুণ্ডী মা"। তখনও আমার হাত ধরা ছিল। তখন আমিও তাঁহার হাতখানা খুব জোরে চেপে ধরিলাম যাহাতে হাত ছাড়িয়ে না যান। দেখিলাম তাঁহার বয়স ত্রিশ পয়ত্রিশ। রংটি শ্যামবর্ণ, হাতে শাখা, শাড়ী পড়া। মাথায় কাপড় আছে। মার হাত ধরে আমরা চলিতে লাগিলাম। বহুদূর যাওয়ার পর মা একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানটি বাঁধান ছিল এবং পেছনে দেওয়াল ছিল ও তাহাতে থাক্ থাক্ করা তাক ছিল। সেই তাকের উপর ঝক্‌ঝকে ঘটি ও গ্লাস ছিল। তাহাতে জল ভরা ছিল। মা আমাকে বলিলেন—"আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে আসতে হ'য়েছে।" আমি তখন ঐ তাকের উপর থেকে জল এনে ভাবিলাম যে শুধু জল দেব ? আমার কাছে তো মিছরি আছে (আমার কাশি খুব হতো'বলে সঙ্গে মিছরি রাখিতাম)। মাকে এক টুকরা মিছরি দিয়া জল দিলাম। মার জল খাবার পর আমরা পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম! চলার সময় মার হাতটি খুব জোরে ধরে রাখিয়াছিলাম। এইভাবে অনেক দূর চলার পর আমাকে বলিলেন যে এইবার এই রাস্তা ধরে তুমি যেতে

পারবে। গলার স্বর শুনে চেয়ে দেখি এতো সে মা নয়—এতো "বাবা।" মা কি ক'রে আমার হাত ছেড়ে চলে গেলেন এবং বাবা কি করে আমার হাত ধরলেন এই ভেবে বাবার দিকে চেয়ে দেখতে লাগিলাম। দেখিলাম—খুব বৃদ্ধ না হইলেও বৃদ্ধ। রংটি শ্যামবর্ণ, চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, মাথার চুল কাঁচাপাকা মেশান একটু লম্বা ও এলোমেলো। মুখে দাঁড়ি গোপ আছে তাহাও কাঁচাপাকা মেশান। ভাবে যেন বিভোর হ'য়ে আছেন। চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি তিনি কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তখন আমি তাঁর নির্দ্দেশ মত রাস্তা ধরে চলে এলাম।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা

অনেক দিন পূর্ব্বের আর একটি ঘটনা। তখন আমি গণেশমহল্লায় থাকিতাম। কলিকাতা হইতে শ্রীমন্মথনাথ রায়, তার স্ত্রী ও অমিয় রায়চৌধুরীর বৃদ্ধা মাতাসহ আমার নিকট আসে। তাহারা ইহার পূর্ব্বে কখনও কাশী আসে নাই। তাই শ্রীগুরু-স্মরণ করে রওনা হয় এবং যথাসময়ে কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা দুটি রিক্সা ঠিক করে এবং গণেশমহল্লায় নিয়ে যেতে বলে। তাহারা যখন গোধুলিয়ার নিকট এসেছে তখন একটি ছেলে তাহাদের রিক্সা ধরে ও রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর, গলায় পৈতা, খালি গায়। তাহারা উহাকে পাণ্ডা মনে করে ছেলেটিকে বলিল- "আমাদের পাণ্ডার প্রয়োজন নাই। আমাদের মা এখানে গণেশমহল্লাতে

আছেন, তাঁর ওখানেই যাব।" ছেলেটি তখন বলিল, "আমি তোমাদের রাজবালা মাকে চিনি। আমি তোমাদের সেইখানেই নিয়ে যাব।" ইহা শুনিয়া তাহাদের মনে ভয় হইল যে ছেলেটি গুণ্ডা নয়তো ! শেষে কি গুণ্ডার হাতে আমরা পড়িলাম। একটা গলির মোড়ে আসিতেই সেই ছেলেটি তাহাদের রিক্সা থামাইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনারা এখানে নামুন। এইদিকে যেতে হবে। এ গলিতে রিক্সা চলবে না।" এই বলিয়াই সে মালপত্রগুলি রিক্সা হইতে নামাইয়া লইল এবং বলিল—"রিক্সার পয়সা দিয়ে উহাদের ছেড়ে দিন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুন, আপনাদের মার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি।" ইহা শুনিয়া তাহারা রীতিমত ভয় পাইয়া গেল এবং তখন কি করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ঠিক করিল একজন রিক্সাতে থাকিয়া প্রথমে কেহ বাড়ী দেখিতে যাইবে। কিন্তু সেই ছেলেটি উহাদের বলিল—"ভয় নাই, আমার সাথে আসুন, আমি আপনাদের মায়ের বাড়ী ল'য়ে যাচ্ছি। আমাকে কি বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমি তোমাদের রাজবালা মাকে চিনি।" এই বলিয়া ছেলেটি নিজেই মালপত্রগুলি উঠাইয়া লইয়া তাহাদের সঙ্গে আসিতে বলিল। তখন তাহারা রিক্সার পয়সা চুকাইয়া দিয়া সেই ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছুদূর আসিয়া একটি বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া মালপত্রগুলি নামাইয়া বলিল, "এই আপনাদের মায়ের বাড়ী, ঠিকানা দেখে নিন। হয়েছে তো ?" তাহারা বাড়ীর নম্বর দেখিয়া বুঝিল যে বাড়ীর নম্বর ঠিকই আছে। এমন সময় পাশের বাড়ীর একটি ছেলে

জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি কলকাতা থেকে এসেছেন।" তাহারা হাঁ বলায় ছেলেটি বলিল, মালপত্র নিয়ে এ বাড়ীতেই আসুন, এখানেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এমন সময় সদর দরজায় লোকের কথাবার্ত্তা শুনে আমি গিয়ে দেখি তাহারা এসে গিয়েছে। আমাকে দেখে তাহাদের খুব আনন্দ ও নিশ্চিন্ত হলো। তখন তাহারা আমাকে বলিল, "মা, কুলিকে কত পয়সা দিব ?" আমি কুলিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আমি আট আনা নিব। আমি বলিলাম, এতটুকু রাস্তা এসেছ আট আনাই নেবে। তখন কুলি বলিল, উহারা যে আটআনাই দেবে বলেছে। কুলিকে খুচরা পয়সা না থাকায় একটি টাকা দিয়া আট আনা ফেরত চাহিলে কুলি বলিল, আমার কাছে আট আনা পয়সা নেই। টকো রেখে দিন, আট আনা পয়সা এনে আপনাদের দিয়ে টাকা নিয়ে যাব। এই বলে কুলিটি চলিয়া গেল। ইহার পর আট নয় দিন কেটে গেল। কুলি আর পয়সা নিতে এলো না। তখন উহারা চিন্তায় পড়িল এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে কুলির পয়সা কি করিব। তখন আমি বলিলাম যে কলকাতা যাবার পূর্ব্বে যদি কুলি পয়সা না নিয়ে যায় তখন ঐ পয়সা ভিখারীকে দিয়ে দিও। এই কথা হবার কয়েকদিন পরে একদিন আসনে বসে আছি। এমন সময় বাণী হলো—"পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো গুরু, আর পয়সা দিবে ভিখারীকে ?" ইহা শুনিয়া একদিন উহাদের সঙ্গে করে বাবার আশ্রমে গিয়ে বাবার ভোগ দিবার ব্যবস্থা করা হ'লো।

দেব মন্দিরে দর্শন ও জ্ঞানগঞ্জে দর্শন

২৪শে শ্রাবণ ১৩৭২ সন, সোমবার বৈকাল ছয়টা, নিত্যকার মত যেখানে মন্দিরের গৌরীপীঠে অর্থাৎ শিব, গোপাল, মা দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী আছেন, ঐ বেদীর নীচে দেখি বিরাট্ ব্যাপার। যতদূর দৃষ্টি পড়ে কেবল শিব, সব বাণলিঙ্গ। মাঝখানে বিরাট শিবলিঙ্গ। যেখানে অখিলেশ্বর শিব আছেন ঐ নিশানায় তবে ঠিক নীচে নয় একটু দূরে। প্রত্যেক শিবের মাথায় ফুল বিল্বপত্র দেওয়া আছে। বিল্বপত্রগুলি খুব বড় বড়। ফুলের চেয়ে বিল্বপত্রই বেশী। বড় শিবের গলায় মালা আছে। ইহার পর দর্শন করি বড় বাণলিঙ্গ শিবের বেদীর উপর অসংখ্য দেবদেবী। তাঁহারা বেশ সাজগোজ করা। মাথায় সোনার মুকুট পড়া। তাঁহারা ঐ বড় শিবটিকে নিয়ে বেদী সমেত যেমন গাড়ী চলে সেই রকম করে অর্থাৎ দেবদেবীরা ঐ শিবকে নিয়ে চলে গেলেন। কতক দেবদেবী সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন। একটু পরে দেখি ঐ শিবকে নিয়ে পুনরায় তাঁহারা ফিরে এলেন। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে দেখি ঐ শিবের পাশে ছোট ছোট দেবদেবী সব উঠে বসিলেন। আবার দেখি শিবের ভিতর হইতে দেবদেবী বাহির হইতে লাগিলেন। পরে দেখি শিব নাই। ঐ বেদীর উপর সবাই গোল হয়ে বসে রয়েছেন। কেহ কেহ দাঁড়াইয়া ও কেহ কেহ বসিয়া আছেন। তারপর আমার ডান দিকে লক্ষ্য পড়িতে দেখি বহু বিরাট বিরাট শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। রং সবুজ, মাথায় বিরাট বিরাট মুকুট, সেজেগুজে সিংহাসনে বসে রয়েছেন।

আমার বাম দিকে দেখি দেবীরা রয়েছেন, অনেক বড় জায়গা। তাঁহারা কেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ কেহ পরস্পরে কথা কহিতেছেন। এখানে সকলের মাথায় মুকুট নাই। দেবী-মাদের মাথায় কাপড় আছে। কাহারও মাথার কাপড় পড়িয়া গেলে আবার উঠাইয়া দিতেছেন। কাহারও নাকে নথ আছে। কেহ কেহ সাজগোজ করিতেছেন। আবার কেহ কেহ আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে দেখিতেছেন। আবার কেহ আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন। আবার কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে চলে যাচ্ছেন। আবার দেখি দেবীমারা গোল হয়ে বসে তুলিতেছেন আর মাঝখান হ'তে জল উঠে জলময় হ'য়ে গেল। তখন ঐ জলে সাঁতার দিয়া মায়েরা জল-ক্রীড়া করিতেছেন। ঐভাবে বহুক্ষণ জল-ক্রীড়া করার পর দেখিলাম পূর্ব্বে যেভাবে বসেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই মায়েরা বসে রয়েছেন। এত যে গভীর জল তোলপাড় কচ্ছিল তার কোন চিহ্ন নাই। এর আরো রহস্য অনেক আছে তাহা ভাষা দিয়া লেখা যায় না; সবই জ্যোতির ব্যাপার। ইহার পর দেখি অসংখ্য ছাগল যাচ্ছে। ছাগলগুলি দেখিতে পুষ্ট! ইহাদের রং সাদা, লাল, কালো মিশানো। কালো রংয়ের ছাগলই বেশী। তাহারা এত গায়ে গায়ে লেগে চলিতেছে, মনে হচ্ছিল যেন স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ ধরে একের পর এক চলেই যাচ্ছে। তারপর দেখি ঐ স্থানে নদী কিংবা গঙ্গা হ'য়ে গেল। ঐ সব ছাগলগুলি ঐ জলে হাবুডুবু করে সব স্নান করিতে লাগিল। পরে দেখি ঐ নদীর পাড়ে দেবীমারা সব দাঁড়াইয়া

আছেন এবং জল হইতে একটি একটি করিয়া ছাগল তুলিতেছেন, যখন কোলে তুলেন তখন আর ছাগল থাকে না, একটি করে ছোট বাচ্চা ছেলে হ'য়ে যায়। বেশ সাজগোজ পোষাক পরা জ্যোতির্ম্ময় চেহারা। একটু পরে দেখি, যে ছাগলগুলি জলের মাঝখানে আছে। কিনারায় পৌছায় নাই, দেবীমারা জলে নেমে তাহাদের গায়ে হাত দিয়া উঠাইয়া লইতেছেন। যখন কোলে তুলিয়া নেন তখন আর ছাগল না; সব দেবীমাদের কোলের ছেলে। ইহার পর দেখি পূর্ব্বে যেমন স্থান ছিল সেইরূপ হয়ে গেল। নদী বা গঙ্গা আর নাই। এই দর্শনটা "জ্ঞানগঙ্গের।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাণী ও উপদেশ

আজ কালের কথা নয়। কয়েক বৎসর আগের কথা। গুরুর বাণী। গুরু বলিলেন—"বাইরের দ্রব্য আর তোমার কি কাজে লাগিবে। তাঁকে পাইবার জন্য যে যে দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাই আহরণ কর। বাইরের ভাবগুলি কমাইয়া ফেল। শান্ত হইতে চেষ্টা কর—শান্তি পাইবে। মূল্যবান্ জিনিষ কি জান? বাইরের টাকাকড়ি, ধন সম্পত্তি নয়। একের ধন অন্যে মারে। বিষয় ভ্রান্তি মূলক জিনিষ। ভ্রান্ত জীব এই বিষয়ের রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। আবার পাইবার জন্য চেষ্টাও করিতেছে। উঠিতেও জানে না, উঠিতেও চায় না। তাই ভগবান এদের জন্য দণ্ডের বিধান রাখিয়াছেন। কৃতকর্ম্ম সকল জীবেরই আছে। তাই এই মানব দেহ ধারণ করা ভোগ করবার

জন্যে। কি করবে তুমি ? সঞ্চিত কর্ম্মরাশি আছে বলিয়াই তো এত ভোগ। কর্ম্ম না থাকিলে দেহ থাকে না। অদ্ভুত কর্ম্ম, বাপ্‌রে বাপ্‌। চেষ্টার দ্বারাও নিরস্ত করা যায় না। ভোগ তারা করবেই করবে। পাওনা তারা করে এসেছে, আদায় তো করবেই।"

"ঘটে ঘটে বুদ্ধিতো হয়তো প্রকাশ,
মীমাংসার নাহি যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধির কি কাজ।
বিদ্যা বুদ্ধি থাকে যদি জ্ঞান নাহি থাকে,
সে বুদ্ধির ফাঁদে প'ড়ে জীব সকল কাঁদে।

* * *

উত্তম আধার বড় ভালতো হয়,
নির্ম্মল স্বভাব তার দেয় পরিচয়।
পরিপাটি দেহখানি করে যে যতন,
তাহার ভিতরে থাকেন ঈশ্বর সর্ব্বক্ষণ।
মনে মনে রাখে সে মন্দিরের তো ভাব,
এই পুরে আছেন তিনি, পরমেশ্বরের বাস।
সতত সত্য ভাবে কহে যেবা ভাষা,
তাহার ভিতরে তিনি বাঁধেন বাসা খাসা।
নির্ম্মল নির্ম্মল ভাব সদা তো রাখিবে,
আবর্জ্জনা রাশি সব ঠেলিয়া ফেলিবে।

কোথায় যাইবে তুমি খুঁজিতে তাঁহারে,
তোমার হৃদয় ভিতর সতত তিনি বিহরে।
নির্ম্মল করিয়া দেখ নিজ দর্পণ খানি,
আপন স্বরূপ তুমি দেখিবে তখনি।

* * *

ভক্তি ভ'রে ডাক তাঁরে ভক্ত যদি হও।
কামনা বাসনা ত্যজি তাঁহার শরণ লও॥"

জন্মাষ্টমীর পরের দিনের ঘটনা তারিখ······বেলা অনুমান ৯টা—প্রত্যেক দিনের মতন আজও গোপাল মন্দিরে গিয়ে বসিলাম।

গোপালের লীলা দর্শন

গোপাল যেমন আসনে আছেন, সেইরূপেই দর্শন করিলাম। আমি উপবেশন করা মাত্র গোপালজীউ আমার দিকে ফিরে চাহিলেন তখন গোপালজীউর রং সবুজ বর্ণ ও কপালে ফোঁটা ফোঁটা দুই লাইন করা চন্দন পড়া, মাথায় হীরার মুকুট, চারিদিকে জ্যোতিতে ঝলমল করিতেছে। গোপালের হাতে এক সোনার নাড়ু আছে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই নাড়ুটি হাতের উপর করেই হাঁ করিয়া কাঁদিতে থাকে। আজও প্রথম সেই কান্নাই দেখিলাম। ধীরে ধীরে দেখিতে পাইলাম নাড়ুটি একটি মূর্ত্তি হইল। মাথায় কাপড় দেওয়া ও মুকুট পড়া। ক্রমশঃ গোপাল নিজে হাতখানি মুখের ধারে নিয়ে গেলেন।

বার বার ঐ মূর্ত্তিটির মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম সত্যই কি কিছু চোখে দেখিতেছি। বার বার দেখিতে লাগিলাম কিছুক্ষণ পর গোপালের বাম দিকে আর একটি স্ত্রী মূর্ত্তি প্রকট হইল। গোপাল তাহাকে হাত বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এদিকে গোপালের ডান দিকে পাগড়ী মাথায় আর একটি মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। তাঁহার মুখে গোঁপ আছে। গোপালের কাছে আসিয়া বসিলেন। মূর্ত্তিটি বেশ বড়। তাহার পাশে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া বসিলেন। মূর্ত্তিটি বেশ বড়। তাহার কোলের উপর আর একটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি। তখন আদর করে হাতে একটি পাত্র ছিল তাহাই দিয়ে সেই কৃষ্ণ মূর্ত্তিকে খাওয়াইতে লাগিলেন। গোপাল বারে বারে ঐ মূর্ত্তির দিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন অনুমানে বুঝিলাম "নন্দ ও যশোদা রাণী।" বহুক্ষণ তাঁহাদের দর্শন করিতে লাগিলাম। তাহার পর মূর্ত্তিগুলি জ্যোতি হয়ে গোপালের পাদপদ্মে লীন হইল।

সঙ্গীত-চর্চ্চা

(ধর্ম্মার্থে)

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, কবিরত্ন।

সঙ্গীত একটি কলাবিদ্যা বা সুকুমার শিল্প বলিয়া গণ্য। অন্য কলাবিদ্যা অপেক্ষা ইহার মর্য্যাদা এই কারণে অধিক বলা চলে যে, ইহা অতি মনোরম এবং অনেক সময়ে বেশ সফল ভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ভক্তদিগের ত কথাই নাই, জ্ঞানী ও যোগিগণও ইহা উপেক্ষা করেন না, শক্তি থাকিলে ইহার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের বাল্যাবধি সঙ্গীতে অসাধারণ স্বভাবসিদ্ধ পটুতা ছিল, গাহিতে ত পারিতেনই, গান রচনা করিতেও পারিতেন। তাঁহার বার বৎসর বয়সে রচিত গানও তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তিনি ১৪ বৎসর তিন মাস বয়সে জ্ঞানগঞ্জ গমন করেন। দুই তিন বৎসর মধ্যেই তাঁহার "বিশুদ্ধানন্দ" নাম-করণ হয়। বাল্যাবধি এই সময় পর্য্যন্ত তিনি যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে "ভোলানাথ" এই ভণিতা দেওয়া আছে। বিশুদ্ধানন্দ নাম প্রাপ্তির পরে রচিত সকল গানে "বিশে ক্ষেপা"—এইরূপ ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তিনি মোট তিন চারিশত গান রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ৪৩টি

পাইয়া "গীত-রত্নাবলী—প্রথম ভাগ" এই নাম দিয়া এক পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আমি বাবা হইতে আরও ৪০টি গান পাই। আমি অধিক দিন তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলে আরও অনেক গান আদায় করিতে পারিতাম। আমার প্রাপ্ত ৪০টি গান "বিশুদ্ধবাণী"র প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। জ্ঞানগঞ্জ গমনের পূর্ব্বে কোনও ওস্তাদ হইতে বাবার সঙ্গীত-শিক্ষা হয় নাই। সঙ্গীতে তাঁহার তখন অশিক্ষিত পটুত্বই প্রকটিত হইয়াছিল! জ্ঞানগঞ্জে তিনি যথারীতি সঙ্গীত শিক্ষা করেন—শুধু কণ্ঠ-সঙ্গীত নহে, সেতার ও পাখোয়াজ বাজনায় দক্ষতা অর্জ্জন করেন। জ্ঞানগঞ্জে সঙ্গীত শিক্ষা ব্যবস্থার হেতু কি হইতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সব রসই ত এক মূল হইতে আসে, রস শুদ্ধ করিয়া লইলে তদ্দ্বারাই রসস্বরূপের কাছে যাওয়া যায়। এই কারণেই জ্ঞানগঞ্জে গানও শিক্ষা দেওয়া হয়।

জ্ঞানগঞ্জে যখন শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, সঙ্গীত সেখানে সাধন-ভজনের অঙ্গরূপেই গণ্য হয়। ভক্তিপথে উহার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু জ্ঞান ও যোগের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য সমাধান কঠিন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্পর্কে তাঁহার অতি পুরাতন শিষ্য উপেন্দ্র চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,* "সেরূপ মধুর কণ্ঠের গান আমি আর শুনি নাই। অদ্যাবধি

*বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কোথাও গান শুনিতে গেলে আর গান ভাল লাগে না। তিনি প্রতি রাত্রেই (গভীর রাত্রে) আপন মনে এমনি গান করিতেন, আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। মধুর শব্দ শ্রবণে বিষধর সর্প যেমন ফণা উচ্চ করিয়া থাকে আমার অবস্থাও সেইরূপ হইত। এখনও সেই প্রকার সুমিষ্ট গান শুনাইবার জন্য অনেক বার বলিয়াছি—কিন্তু আর হয় না। বলেন, উপেন্দ্র, সেদিন আর নাই।"

সাধারণতঃ দুই ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা সময় বাদে সমস্ত রাত্রি বাবার যোগ ক্রিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বোধ করি কঠিন ক্রিয়া-দ্বয়ের মধ্যে দেহকে কিঞ্চিৎ বিরাম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি কিঞ্চিৎকাল সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। কিছুদিন পরে যে তিনি উহা করিতেন না তাহাও উপেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কথা হইতেই প্রতীয়মান হয়। তাঁহার প্রদত্ত ক্রিয়ার উপকারকরূপে তিনি কোনও শিষ্যকে (স্বাভাবিক পটুতা বা শিক্ষা থাকিলেও) গান করিবার আদেশ বা উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি যে কেবল গভীর রাত্রিতেই গান করিতেন এরূপ নয়, তিনি দিবাভাগেও অনেক সময় একাকী তানপুরা নিয়া গাহিতেন। "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গে" শ্রীমতী লীলাবতী গুপ্তা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এটা রস-সাধন রূপেই করিতেন। তাঁহার সঙ্গীতপটু শিষ্যগণের পক্ষে তাহা করা অবশ্যই অনুমোদন যোগ্য ছিল। সেরূপ কোনও শিষ্য বা অন্য কোনও লোক তাঁহার নিকটে গেলে তিনি তাঁহাকে গান গাহিতে বলিতেন এবং শুনিয়া সুস্পষ্ট আনন্দও পাইতেন।

সাধনের অঙ্গরূপে সঙ্গীতের মনোরম প্রয়োগ মীরাবাঈ, কবীর, তানসেন, গুরু হরিদাস, নানক প্রভৃতি অনেক সাধক ও মহাযোগীতেও দেখা যায়। বঙ্গদেশে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছেন সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সেন। তিনি ৺কালীপূজা করিতেন এবং গুরুদত্ত মন্ত্রও অবশ্য জপ করিতেন। কিন্তু গানই ছিল তাঁহার সাধনের প্রধান অঙ্গ এবং সিদ্ধির প্রধান হেতু। তিনি রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত গায়ক ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু খুব সুকণ্ঠ ছিলেন এবং স্বরচিত সঙ্গীতই স্বরচিত একটি মাত্র সুরেই গাহিতেন। তাঁহার গানের একাগ্রতা নিষ্ঠা ও গভীর ভক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়া জগজ্জননীকে টানিয়া কাছে আনিত, এমন কি একদিন রামপ্রসাদ যখন বাগানের বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে গান করিতেছিলেন, তখন কন্যা-বেশে আসিয়া বেড়ার অপর দিক্ হইতে বন্ধন রজ্জু বা বেত ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার সাহায্য করিতেও নিযুক্ত করিয়াছিল। গানে একটু বিরাম হইলেই মা বলিতেছিলেন, "বাবা তুমি গাও।" সঙ্গীতে অশিক্ষিত পটুত্ব এবং সরল সরস ভাষা এখানে অসামান্য রূপেই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এইজন্যই তাঁহার "মালসী" গান এককালে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সকল স্তরের গায়কের কণ্ঠে শুনা যাইত। আর কাহারও গান এরূপ, সকল শ্রেণীর জনপ্রিয় আর হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যাইতে পারে। একদিন কলিকাতায় যোগেশ বসু দাদার গৃহে (আমাদেরই সমক্ষে) একজন সুগায়ক রজনী সেন মহাশয়ের কয়েকটি গান

শ্রীশ্রীবাবাকে শুনাইয়া ছিলেন। সকলেই জানেন রজনী সেনের গানের ভাষা ও ভাব মনোরম এবং সুরগুলিও চিত্তাকর্ষক। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা রজনী সেনের গানের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন; তিনি সেদিন বাবার সমক্ষে উক্ত কবির রচনার অজস্র প্রশংসা করিতে থাকেন। বাবা কিছুক্ষণ ধরিয়া উহা শুনিয়া বলেন, এই সকল গানে দেখিবে একটু বেহ্ম বেহ্ম (ব্রাহ্ম) ভাব আছে, মনে হয় রচয়িতা যেন ডালে ডালে ঘুরিতেছে, আসল বস্তুটি ধরিতে পারে নাই। আর রামপ্রসাদের গানে দেখ অতি সামান্য—প্রায় গ্রাম্য—কথায় কেমন ভাব ফুটিয়াছে। সে যে আসল বস্তু ? স্বাদ পাইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আসল বস্তু না পাইলে আর হইল কি ?—

রামপ্রসাদের পরে কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী, রাজমোহন আম্বুলী প্রভৃতি কতিপয় শক্তিশালী সাধক স্বরচিত গীত দ্বারা মায়ের চরণে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। ইঁহাদের কয়েকটি গান বাবার প্রিয় ছিল। তাঁহার সঙ্গীত নিপুণ শিষ্য মাখন ভট্টাচার্য্যকে ঐ সকল গানের মধ্যে একাধিক দিন এই সুবিখ্যাত গানটি গাহিয়া তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে দেখিয়াছি।

মা, তোমার মায়া বিভূতি
জানে কে আর তুমি বিনে ?
জান্‌লে জান্‌তে পারে মাত্র, মা,
যে নয় তন্মাত্র অধীনে।
ইত্যাদি।

এককালে এই শাক্ত ধারার সঙ্গীত বঙ্গদেশে বহু স্থলেই

রচিত ও গীত হইয়াছে। এমন কি ত্রিপুরা জিলার এক মুসলমান ভক্ত ওস্তাদের একটি গান আমি বাল্যে ঢাকা জিলাস্থ আমার স্বগ্রামে বহুবার শুনিয়াছি। উহার এই দুইটি কলিই এখন মনে পড়ে—

বল মা তোমায়
কি দিয়ে পূজিব ব্রহ্মময়ি,
জানিনা ব্রহ্মাণ্ডে কিছু
আছে যে মা তুমি বই।

তান্ত্রিক সাধনের মান্দ্যের ফলেই বাঙ্গালা সঙ্গীতের এই শাক্ত ধারাটি নিরুদ্ধ প্রায় হইয়াছে।

রামপ্রসাদের বহু পূর্ব্বে হইতে—জয়দেবের গীত গোবিন্দের যুগ হইতে—বঙ্গীয় লোক সঙ্গীতে একটি বৈষ্ণব ধারা চলিয়া আসিতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব উহাতে প্রখরতা দান করেন এবং ক্রমে উহাকে বৈষ্ণব সাধনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপেই পরিণত করেন। তাঁহাকে ও নিত্যানন্দকে "সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ" বলিয়া স্তুতি করা হয়। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীবাসের অঙ্গনে নাম,কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। ঐ কীর্ত্তনটিতে তখন মাত্র দুইটি কলিই ছিল—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥

অথচ এই কীর্ত্তনে গায়কদের সাত্ত্বিক ভাবের এরূপ প্রবল উচ্ছ্বাস হইত যে, তাঁহারা মাটিতে গড়াগড়ি হইয়া "দশা" প্রাপ্ত হইতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তামিল ভাষী আড়বারগণের গীতির প্রভাবে পদাবলী গানের দিকে আকৃষ্ট হন। তখন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি　　　রায়ের নাটক গীতি
　　কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ,
স্বরূপ রামানন্দ সনে　　　মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
　　নাচে গায় পরম আনন্দ।

তদবধি বৈষ্ণব কীর্ত্তনে নাম ও লীলা এই দুই রীতির আবির্ভাব হইয়াছে। উত্তরকালে পদকর্ত্তারা পদের মাধুর্য্যের সহিত নানা প্রকার সুর ও তালের সংযোগ করিয়া লীলাকীর্ত্তন কে খুবই সমৃদ্ধ করেন। ইহাতেও মনোহর সাহী, রেণেটী প্রভৃতি চারিটি প্রণালী বা school আছে। কোনওটিই খুব সহজ নহে।

পদাবলী কীর্ত্তন শ্রীশ্রীবাবাকে কোনও দিনই মুগ্ধ করিতে পারে নাই। উহার ভাব সকল তিনি কৃত্রিম মনে করিতেন এবং বলিতেন, ওগুলি পদকর্ত্তাদের কল্পনা মাত্র। উহা নিয়া মাতামাতিতে চিত্তের দুর্ব্বলতা ও যোগপথের অযোগ্যতা জন্মে। ভাব সমাধিকেও তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন। শুধু নামকীর্ত্তনকেও বিশেষতঃ দলবদ্ধ হইয়া সকোলাহল কীর্ত্তনকেও তিনি বিশেষ আমল দিতেন না। সেইজন্য তাঁহার কোনও আশ্রমেই কোনও কালে তদ্রূপ কীর্ত্তনের ঘটা দেখা যায় নাই, যদিও অন্যান্য সাধু ও মহাপুরুষগণের আশ্রম বা ভক্তগণের গৃহে তাঁহাদের উপস্থিতিতে অষ্ট-প্রহর, এমন কি তদধিক কাল ব্যাপী নাম-

কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইতে প্রায়ই দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারা বহু লোক তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্টও হয়।

ইদানীং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গুরুকরণ প্রচলিত থাকিলেও গুরুদত্ত মন্ত্র অপেক্ষা নাম কীর্ত্তনের প্রতি আসক্তি ও উৎসাহ অধিক দেখা যায়। অনেকের কাছে উহাই মুখ্য সাধন হইয়া গিয়াছে, অবশ্য অবসর কালে তাঁহারা মালা জপও করেন। তাহাতে আনন্দ কম, দলবদ্ধ হইয়া নাম কীর্ত্তনে আনন্দ বেশী, ভাব এবং "দশা" ইত্যাদিও হয়। ইষ্টগোষ্ঠী বিশেষে নাম কীর্ত্তনের পদেরও ভেদ হয়। যথা—

(১) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

(২) হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

(৩) প্রাণগৌর নিত্যানন্দ।

(৪) বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ।

আরও প্রকার থাকা সম্ভব। এতন্মধ্যে প্রথমটি একটি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন উপনিষদের মন্ত্র। অবশ্য সেখানে দ্বিতীয় ছত্রটি প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে নামকীর্ত্তন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ বাবাজীর সম্মত। ইনি জপের জন্য মন্ত্রও দেন এবং ঐরূপ তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তনের উপদেশও দেন।

সুবিখ্যাত মহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভক্তগণকে উপদেশ দান কালে মধ্যে মধ্যে ভাবস্থ হইয়া গান

করিতেন। তাঁহার রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা না থাকিলেও, তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সুর বোধও তাঁহার ছিল। তিনি বোধ করি রামপ্রসাদের গানই অধিক গাহিতেন, কেন না উভয়ের ইষ্ট-দেবতা এক, এবং উভয়েরই দেবতার সঙ্গে যোগ সাক্ষাৎ ও নির্বাধ। রামকৃষ্ণ দেব গান করিতে করিতে, এমন কি গান শুনিতে শুনিতেও, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিস্থ হইয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেন।

অন্য মহাপুরুষগণের মধ্যে বহু শিষ্যের গুরু শ্রীজিতেন ঠাকুর উপদেশ দান ও তৎসঙ্গে গান প্রায় পরমহংসদেবের অনুকরণে করিতেন। এক বিষয়ে তাঁহার আধিক্য ছিল, তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণের পূর্ব্বে ওস্তাদি গান বাজনা যথারীতি অভ্যাস করিয়া-ছিলেন এবং বহু শিষ্য করিবার পর স্বয়ং নাটক রচনা করিয়া তাহাদের দ্বারা অভিনয় করাইতেন।

শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী সঙ্কীর্ত্তনে উৎসাহী ছিলেন। প্রভু জগদ্‌বন্ধু মন্দিরা সংযোগে অনুক্ষণ রাম নাম গান জন্য শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করিতেন, তাঁহার মতে উহা বিশ্ব জগতের মঙ্গলের কারণ। শব্দের শক্তি বিশ্বব্যাপিনী; উহা একস্থানে উচ্চারিত হইতে থাকিলেও উহার শক্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। তাঁহার এই মত বর্ত্তমান কালে রেডিও সপ্রমাণ করিতেছে। নিউইয়র্কে কোনও বক্তৃতা প্রদত্ত হইবার কালে কলিকাতায় বসিয়াও রেডিওর সাহায্যে তাহা অবিকল শ্রবণ করা যায়।

শ্রীমা আনন্দময়ী গায়ক পিতার কন্যা, কণ্ঠও সুমিষ্ট।

ভক্তগণের অনুরোধে কদাচিৎ গান করেন। তাঁহার আশ্রমে ও অন্যত্রও তাঁহার উপস্থিতিতে নামযজ্ঞে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বা অষ্টপ্রহরাদি ব্যাপী অখণ্ড নাম-কীর্ত্তনে উৎসাহ দান ত করেনই, স্বয়ং গায়কদের সঙ্গে কীর্ত্তনেও যোগ দেন।

শ্রীশোভামার আশ্রমে কীর্ত্তন কদাচিৎ হয়, গান মধ্যে মধ্যে হয়। তবে তাঁহার আশ্রমে দুইবেলা দেবতার আরতির সময় (বৃন্দাবনে সন্তদাস বাবাজী মহারাজের আশ্রমের অনুকরণে) দুইটি হিন্দী ও একটি বাঙ্গালা স্তোত্র সুর সংযোগে উচ্চারিত হয়। ঐ স্তোত্র পাঠ যাহাতে বেসুরা বা বেতালা না হয় তৎপ্রতি উক্ত বাবাজী মহারাজের প্রখর দৃষ্টি ছিল।

বাউল সম্প্রদায়ের গানই প্রধান সাধন। তাহাদের মধ্যে গুরু করণের প্রথাও প্রচলিত ; সেইজন্যই তাহাদের গানে গুরুর উল্লেখ অত্যন্ত অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার বাল্যে শ্রুত একটি বাউল গানের দুইটি কলি এখানে দিলাম—

গুরু দয়াল হৈলে হবে কি ?
আমি যে ভক্তিহীন, ভক্তিহীন !
গুরু দয়াল বটে সত্য,
আমি হৈলাম অপদার্থ। (ইত্যাদি)

পূর্ব্ব বঙ্গে আর এক প্রকার লোকপ্রিয় ধর্ম্ম ভাব ভূয়িষ্ঠ সঙ্গীত ছিল (এবং বোধ করি তত্রত্য হিন্দুগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনেও কিছু আছে) ভাটিয়ালি গান। নদী বহুল অঞ্চলে

এবং বর্ষার বন্যায় নৌকার মাঝিরা অনুকূল স্রোতে নৌকা স্বল্পায়াসে বাহিতে বাহিতে ভাটিয়ালি গান গাহিত। ঐ গানে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের প্রসঙ্গই অধিক; অন্য তত্ত্বও আছে। একটির আংশিক দৃষ্টান্ত এই—

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে,
আমি আর বাইতে পার্‌লাম না।

ভাটিয়ালি গান ধর্ম্ম সাধনে প্রযুক্ত হয় না, তবে ধর্ম্মভাব পুষ্ট করে।

শ্রীগুরু-স্মৃতি

শ্রীতড়িৎপ্রভা ঘোষ

পরম আরাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের মহিমা প্রকাশ করার জন্য শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ দাদার আদেশ মত শ্রীশ্রীবাবার মহিমা যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা সামান্য জানাই।

আজ হইতে প্রায় আঠাশ উনত্রিশ বছর আগে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার ঘোষ প্রাণ-সংশয় রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাবা সে সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার নিকট গিয়া অজিতের প্রাণভিক্ষা করি। তিনি বলেন যে কয়েকটি মারাত্মক গ্রহের প্রকোপে এইরূপ হইয়াছে। নারায়ণের চরণে তুলসী দিবার আদেশ দিলেন। ক্রিয়া করার পর চণ্ডী-স্তব করা ভাল তাহা বলিলেন। পরে কেমন থাকে সংবাদ দিবার জন্য বলিলেন। তখন Medical College এর বড় Surgeon গণ অজিতের চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রায় ছয় মাস অন্তর অজিতের দেহে অস্ত্রোপচার করা হইত। বাবার শ্রীচরণে এই সংবাদ নিবেদন করার পর তিনি বলিলেন, "ডাক্তাররা বারবার বৃথাই অপারেশন করছেন। এই রোগ শীঘ্র যাবে না। সময়ে সারবে।"

বাবার কৃপায় অজিত দশ বৎসরে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইল।

উপস্থিত সে এখন দিল্লীতে Orthopaedic Surgeon। তাহার কন্যা শ্রীমতী বিনতা ও পুত্র আশিসকুমার।

শ্রীশ্রীবাবার মর্ম্মর মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে আমরা কাশীধামে ছিলাম। মহাসপ্তমী পূজার দিন সকালে আশ্রমে গিয়া শুনিলাম, শ্রীশ্রীবাবা এইমাত্র উপরে গিয়াছেন। তাঁহার দর্শন পাইব না। ইহাতে আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল। বহুদিন হইতেই তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের আশা অন্তরে ছিল। একবার যদি তাঁহার দর্শন পাই, সেই আশায় নীচে বসিবার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অন্তর্যামী বাবা আনন্দময় মুর্ত্তিতে ভিতরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। সত্বর আসিয়া তাঁহার চরণ নিলাম। কুশল প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেরী করলে কেন গো? ভেতরে যাও।" ভিতরে গিয়া শুনিলাম মহামায়ার চরণে সকলেরই পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। পুষ্পাঞ্জলি দিবার আশা বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। প্রায় মিনিট পনেরো পরে বাবার আদেশে আবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইল। ৺বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় আমরা যখন বাবার নিকট প্রণাম করিবার জন্য আসিলাম, তখন সন্ধ্যা সাত ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আশ্রমস্থ দাদা—দিদিরা আমাদের কহিলেন, "এত দেরী করে কেন এলেন? বাবা ত' ওপরে চলে গিয়েছেন। আর ত' নামবেন না।" বাবার শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করিতে পাইব না জানিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইলাম। বাবার অসীম কৃপা, আমাদের অন্তরের কাতর ডাক বোধ হয়

তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে বাবা নীচে আসিলেন। আমরা সংবাদ পাইলাম বাবা নীচে আসিয়াছেন। তখন বাবার কাছে অন্য কেহ না থাকাতে আমাদের সাংসারিক অশান্তির সংবাদ তাঁহাকে সবিশেষ জানাইলাম। শ্রীশ্রীবাবা তখন আমার শ্বশ্রু-মাতা ও তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, "তোমরা এ কাজ কি করে করলে? জানতে না এই লোকটি অতি অসৎ। কেন একে আশ্রয় দিয়েছ? এ তোমাদের সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় আছে। খুব শীঘ্রি একে জানিয়ে দাও আমার আদেশ। তোমাদের বাড়ীতে এসে থাকা হবে না। আর তোমরা একে কখনও ঢুকতে দিও না।" বাবার আদেশে, সেইদিনই তাহাকে পত্রযোগে আমাদের বাড়ীতে আসা হইবে না, জানান হইল। সেই সময়ই কোজাগরী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীবাবার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ণিমার দিন আশ্রমে গিয়াছিলাম, বাবার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। কারণ আমার জীবনে সেইবারই সর্ব্ব-প্রথম বাবার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সৌভাগ্য হইল। ইহার পূর্ব্বে এই সৌভাগ্য হয় নাই। চতুর্দ্দশীর দিন রাত্রে আমার কলিক্ ব্যথা হয়। তাহা সত্ত্বেও আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করি। বাবার অপার মহিমা। এই ঘটনার পর আর আমার কলিক্ ব্যথা হয় নাই।

শ্রদ্ধেয় দাদারা ও দিদিরা সকলেই জানেন যে শ্রীশ্রীবাবার কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর সকল সময়ে সমভাবেই আছে। গত

১৩৬৯ সালে, আমার তৃতীয় পুত্র অরুণ বাত রোগাক্রান্ত হয়। তাহার গলায় ও হাতে যন্ত্রণা হওয়ায় কাতর হইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে স্মরণ করে। বাবার নিকট দীক্ষিত না হইলেও সে তাঁহার ফটো পূজা করে। কৃপাময় বাবা স্বপ্নযোগে আমাকে আদেশ দেন তোমাদের পুত্রের মারাত্মক গ্রহ প্রকোপ হইবে। শীঘ্রই গ্রহ শান্তি করা দরকার। এই স্বপ্ন দর্শনের পর মন অত্যন্ত অস্থির হয়। কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ দাদাকে সকল বিষয় জানাইয়া আশ্রমে শান্তির জন্য টাকা পাঠাই। পরে শ্রদ্ধেয় দাদার নির্দ্দেশ মত শান্তি পূজা হয় ও প্রসাদী নির্ম্মাল্য পাঠাই। অরুণের নিকট তাহার রোগের বিষয় পরে জানিয়াছি। আমি চিন্তিত হইব ও মনঃকষ্ট হইবে এইজন্য সে পুর্ব্বে আমাকে এই সংবাদ দেয়নি। ছয় মাস রোগ ভোগের পর এখন সে সম্পুর্ণ সুস্থ। করুণাময় বাবার কৃপায় সবই সম্ভব হয়।

গত বৈশাখে অরুণ কলিকাতা হইতে মোটরকার যোগে তাহার কর্ম্মস্থলে রাউরকেলায় যাত্রা করে। দুর্গাপুরে আসে, তখন সুনীলের বাসায় ছিলাম। সেইদিন যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের ফটোর সম্মুখে সস্ত্রীক প্রণাম করে। আমার নিকট আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য চাহিলে তাহাকে বলিলাম—বৈশাখ মাস প্রায় ঝড় জল হচ্ছে, আজ আকাশের ধরণও ভাল দেখি না। সঙ্গে ছোট শিশু আছে। তুমি রক্ষাকর্ত্তা শ্রীগুরুদেবকে নিয়ে যাও। ইহা বলিয়া "বিশুদ্ধবাণী" পুস্তকটি তাহাকে

দিলাম। রাঁচী পৌঁছিয়া সংবাদ দিতে বলিলাম। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রবল ঝড় ও জল হয়। তখন উহারা রাঁচী পৌঁছে নাই। ঝড়ের সময় তাহার সত্তঃক্রীত মোটরকার হঠাৎ বিকল হইয়া যায়। সেজন্য তাহারা সেই সময় অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। ঐ ঝড়ের মধ্যেই আরও দুইটি মোটরকার ঐ পথে আগাইয়া যায়। ঝড়ের বেগ কমিলে তাহারা যাত্রা সুরু করে, পথে ঐ দুটি কারকে ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পায়। পূর্ব্ব স্থান হইতে এইস্থানে ঝড়ের গতি প্রবল ছিল কয়েকটি বৃক্ষ পতিত দেখিয়া তাহাও বুঝিতে পারে। তখন তাহাদের স্মরণ হয় যে কারটি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিকল হইয়াছিল। লেখা বাহুল্য যে শ্রীশ্রীবাবার মহিমা অপার। আমাদের প্রত্যেকেই অন্তরে অনুভব করি। অশোককুমায় ও শক্তিপ্রসাদ পশ্চিম জার্ম্মানীতে শিক্ষা লইবার জন্য গিয়াছে। তাহারাও পত্রযোগে জানায় "চিন্তা করো না মা। গুরুদেব আছেন, তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।—জয়গুরু!"

জপ বিজ্ঞান

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
এম, এ, ডি, লিট্, পদ্মবিভুষণ।

১। অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন যে জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তর্ম্মুখী গতি লাভ হয় না কেন এবং যখন অন্তর্ম্মুখী গতির উদয় হয় তখন ঐ গতির চরম লক্ষ্যই বা কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে জপের বিজ্ঞানটি ভালরূপে বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ জপ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। একটি বাচিক জপ, একটি উপাংশু জপ এবং একটি মানস জপ—এই তিন প্রকার জপের মধ্যে বাচিক জপ নিষিদ্ধ এবং মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণতঃ অগম্য। এইজন্য উপাংশু জপের বিধান অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই তিন জপেরই বৈশিষ্ট্য একই প্রকার। বৈখরী জপে সর্ব্বত্রই বাহ্য বায়ুর আবশ্যকতা আছে, কারণ উহাতে কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বায়ুর আঘাত আবশ্যক হয়। বাস্তবিক পক্ষে উপাংশু জপেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। মানসিক জপে বাহ্য বায়ুর প্রভাব না থাকিবারই কথা, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য বাহ্যে বায়ুর সঙ্গে যোগ রক্ষা না করিয়া মানসিক জপ করিতে পারে না, কারণ যদি তাহা পারিত তাহা হইলে শ্বাসের গতিতে বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইত। এইজন্য বুঝিতে হইবে

প্রথমাবস্থায় যে কোন প্রকার জপ করা হউক না কেন তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বাহ্য বায়ুর প্রভাব না থাকিয়া পারে না।

২। বৈখরী জপ মাতৃকা অথবা বর্ণমালার দ্বারা সম্পন্ন হয়। বর্ণমালা বায়ুর সংহতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মনে মনে বর্ণাত্মক শব্দ চিন্তা করিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া না হইয়া পারে না। বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া হইতে গেলেই কণ্ঠাদি উচ্চারণ স্থানে আঘাত অবশ্যম্ভাবী।

৩। জপ করিতে করিতে যখন জাপকের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় তখন স্বভাবতঃই কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া অথবা চেষ্টা করিয়া কণ্ঠরোধ করিতে হয় না।

৪। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া প্রবাহশীল নাদরূপে পরিণত হয় এবং নাদ বায়ুর সংঘর্ষবশতঃ বর্ণমালা রূপে প্রকাশিত হয়। অতএব বর্ণমালাকে আশ্রয় করিয়া যে কোন প্রকার জপ অথবা শব্দের আবৃত্তি করা হউক না কেন তাহাতে বাহ্য বায়ুর স্পর্শ থাকিবেই এবং বাহ্য বায়ুর স্পর্শ নিবন্ধন অন্তর্ম্মুখ গতিতে অবশ্য বাধা পড়িবে।

৫। এইজন্য অন্তর্ম্মুখ গতি প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রমশঃ বাহ্য বায়ু হইতে আভ্যন্তরীন বায়ুতে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং সর্ব্বাগ্রে বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া আকাশ মণ্ডলে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আকাশের নানা স্তর আছে। বায়ুরও নানা স্তর আছে। আকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তর ভেদ করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ চৈতন্য রাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে।

৬। গুরুদত্ত শক্তি সহায় থাকিলে এবং সাধক উদ্যমশীল হইলে অন্তর্ম্মুখ গতি স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। কালের রাজ্যে পরিণতি স্বাভাবিক। বালককে যেমন যুবক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না এবং যুবককেও বৃদ্ধত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ বৈখরী হইতে পরা পর্য্যন্ত গতি লাভের জন্য যোগীর পক্ষে পৃথক্ চেষ্টা অনাবশ্যক। বৈখরী হইতে মধ্যমাতে সঞ্চার স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। পুনঃ পুনঃ বৈখরীর অভ্যাস করিতে করিতে কণ্ঠদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং হৃদয়দ্বার খুলিয়া যায়। গুরুশক্তি সংযুক্ত জপের প্রভাবে বৈখরী অভ্যাস করিতে করিতে বৈখরী সমাপ্ত হয় এবং মধ্যমাতে প্রবেশ হয়।

৭। যতক্ষণ সাধক বৈখরী ভূমিতে নিবিষ্ট থাকে ততক্ষণ সে বিকল্প ভূমিতে বর্ত্তমান থাকে। বৈখরী ভূমি ইন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার। তাহার সঙ্গে মনের ক্রিয়া না থাকিয়া পারে না, তবে বৈখরী ভূমিতে বাহ্য প্রমেয়ের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু যখন বৈখরী হইতে মধ্যমাতে সঞ্চার হয় তখন বাহ্য প্রমেয় থাকে না, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও থাকে না। কিন্তু বিকল্পাত্মক মনের ক্রিয়া থাকে। বৈখরী অবস্থাতে দেহাত্মবোধ স্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয় এবং সাধকের কর্ত্তৃত্ব অভিমান জাগিয়া থাকে। মধ্যমাতে ঐ অভিমান অনেকটা ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু বিকল্পের উদয় তখনও থাকিয়া যায়। বৈখরীতে জপ করিতে করিতে আপনা আপনি মধ্যমাতে প্রবেশ হয়। সাধারণতঃ জপের

মাত্রা দ্রুত অথবা বিলম্বিত না হইয়া মধ্যম অবস্থাতে থাকা উচিত। এইভাবে নিয়ম রক্ষা করিয়া জপ করিতে পারিলে জপ হইতে ধ্যানের অবস্থা আপনি উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ধ্যান স্থায়ী হয় না। তখন ধ্যান হইতে জপে ফিরিয়া আসিতে হয়। এইভাবে পুনঃ পুনঃ জপ ও ধ্যানের আবর্ত্তন হইতে ধ্যান অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইয়া যায়। যোগীর দৃষ্টিতে জপ ক্রিয়া যোগের অঙ্গ এবং ধ্যান সমাধিও যোগের অঙ্গ। উভয়েরই অনুশীলন আবশ্যক। এদিকে ধ্যানের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। তখন বৈখরী বাক্ নিরুদ্ধ, দেহাত্মবোধ অতি ক্ষীণ এবং বহির্ম্মুখ ভাব নিরুদ্ধ হইয়া অন্তর্ম্মুখ ভাবের সূচনা হইয়াছে। এই অবস্থায় নাদের প্রসার আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাত্মক মাতৃকা বিলীন হইয়া ধ্বনি রূপে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কণ্ঠ নিষ্ক্রিয় থাকে ও হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়। বায়ুর ক্রিয়া তখনও থাকে, কিন্তু ভিতরে। বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া থাকে না। এই অবস্থায় নিরন্তর অনাদি অনন্ত নাদ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই নাদধ্বনি অতি বিশাল। ইহাতে বর্ণাত্মক মাতৃকা সকল লীন হইয়া যায়। জলের তরঙ্গ লীন হইয়া গেলে যেমন জল মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তরঙ্গ থাকে না, তেমনি বর্ণাত্মক তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ধ্যানাত্মক শব্দ আপন প্রভাব নিয়া নাদরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ এই নাদে বর্ণাত্মক নাম অথবা মন্ত্রের তরঙ্গটা থাকে, কিন্তু সাধকের কর্ত্তৃত্বাভিমান বিগলিত হওয়াতে উহা নাদ মধ্যে আপনিই উচ্চারিত হয়, উহাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। ইহাই এক

প্রকার ব্রহ্ম নির্ঘোষ। এই নাদধ্বনি বস্তুতঃ বর্ণাত্মক না হইলেও প্রথমতঃ ইহা বর্ণাত্মক শব্দের মত শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন "বউ কথা কও" পাখীর ডাক, উহা বর্ণাত্মক না হইলেও বর্ণাত্মক রূপে বুঝিতে হয়। উহা বস্তুতঃ ধ্বনিমাত্র, উহাতে বর্ণ-সংঘাত কিছুই নাই। তথাপি সংস্কার বশতঃ ঐরূপ প্রতীতি হয়। সাধক এই সময়ে শ্রোতা হইয়া নিজের অভ্যন্তর হইতে উচ্চারিত নিজ মন্ত্র অথবা নামের ধ্বন্যাত্মক রূপ মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকে। বস্তুতঃ উপনিষদে যে শ্রবণ মননের কথা আছে ইহাই সে শ্রবণ।

নিরন্তর হৃদয়-উত্থিত নাদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে ঐ ধ্বনি হইতে বর্ণের আভাস কাটিয়া যায়। তখন নিরাভাস নাদধ্বনি উঠিতে থাকে। এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে ক্রমশঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং চিদাকাশ নির্ম্মল হইয়া প্রকাশ পায়। সাধারণ প্রত্যেক মানুষই চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে অন্ধকার দেখিতে পায় উহাই বস্তুতঃ হৃদয়ের অন্ধকার। মধ্যমা বাকের ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা ঐ অন্ধকার অপগত হয় এবং চিদাকাশ নির্ম্মল হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, সঙ্গে সঙ্গে নাদধ্বনি ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে বুঝিতে হইবে মধ্যমা ভূমির অবসান সন্নিহিত। এইটি চিত্ত শুদ্ধির অবস্থা। চিত্ত অত্যন্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে একদিকে যেমন অন্ধকার থাকে না অপরদিকে তেমনি ধ্বন্যাত্মক শব্দও প্রায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহা "আধ্যাত্মিক উষারূপে" বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই অবস্থায় মন ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া চিদাকাশের,

দিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। তখন প্রকাশের উদয় হয় নাই, অথচ অন্ধকারও নিবৃত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং রাত্রি অপগমের পর যে অবস্থার উদয় হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ। যে শব্দ এতক্ষণ শ্রুতিগোচর হইতেছিল—অবশ্য আভ্যন্তরীণ—এখন তাহা আর শ্রুত হয় না। এই অবস্থায় চিদাকাশ মধ্যে একটি জ্যোতির মণ্ডল প্রকাশিত হয় এবং সাধক অথবা যোগীর দৃষ্টি ঐ মণ্ডলে আকৃষ্ট হয়। তখন দেহের স্মৃতি থাকে না এবং মনের ক্রিয়া অস্তমিত প্রায়। এই অবস্থার আভাসময়ী চিৎশক্তিরই ক্রিয়া হইয়া থাকে। সাধকের নিষ্ঠা নিরাকার ও নির্গুণ সত্তার উপরে থাকিলে ঐ জ্যোতির মণ্ডলটি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া সত্তার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। তারপর জ্যোতি ভেদ হইয়া পরা বাকে প্রবেশ লাভ হয়। কিন্তু সাধক সাকারের উপাসক হইলে ঐ জ্যোতি মণ্ডল মধ্যে ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ ইষ্ট সত্তা নিজ সত্তার সহিত অথবা নিজ সত্তা ইষ্ট সত্তার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। নিরাকার উপাসকের পক্ষে জ্যোতি মণ্ডলের মধ্যে নিজ স্বরূপও পরিদৃষ্ট হইতে পারে। এই সকল বৈচিত্র্য সাধকের ভাব সাপেক্ষ। যে কোন রূপের প্রকাশ হউক না কেন তাহা জ্যোতির মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং ধীরে ধীরে জ্যোতি অপগত হয় এবং শুধু রূপটিই স্বয়ং প্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকে। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ তখন থাকে না। যেরূপেই প্রকাশ হউক না কেন উহা আত্মারই স্বরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং এই সাক্ষাৎকার অভিন্নতার সূচক। এইটি পশ্যন্তীবাকের

অবস্থা, মন্ত্রসিদ্ধি অথবা ইষ্ট সাক্ষাৎকার ইহারই নামান্তর। প্রাচীন যুগে কোন যোগী অথবা সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইলে তাহাকে "ঋষি" বলিয়া গণ্য করা হইত। এই অবস্থায় মন থাকে না, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও থাকে না, বিশ্ব জগতের ভানও থাকে না, থাকে শুধু চৈতন্যময় স্বরূপের সত্তা। ইহা যে রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন তাহা যে নিজের স্বরূপ তাহা তখন বুঝা যায়। কিন্তু ইহা খণ্ড অবস্থা। ইহারও পুর্ণ পরিণতি আছে। তখন খণ্ড সত্তা অখণ্ড সত্তাতে আত্মপ্রকাশ করে। এইটি উন্মনী অবস্থা এবং আত্মার নিষ্কল সাক্ষাৎকার, ইহাকেই সিদ্ধগণ পরাবাক্ বলিয়া গণনা করেন। ইহা পরাশক্তিরই স্বরূপের অন্তর্গত। মন্ত্র সাধনা অথবা জ্ঞান সাধনার ইহাই চরম লক্ষ্য।

৮। জপ ক্রিয়ার প্রভাবে এই চরম স্থিতি উপনীত হয়। তখন বক্রগতি ত আসেই না, সরল গতিও স্থিতি বিন্দুর মধ্যে একাকার হইয়া যায়। শিবশক্তি সামরস্য তখন আপনি সংঘটিত হয়, আগমবিদ্গণ ইহাকেই আত্মার পূর্ণবিকাশ বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহারও পরাবস্থা আছে। পরাবস্থারও পরাবস্থা আছে। বিশুদ্ধ চৈতন্যের পূর্ণবিকাশ হইলেই সেই অবস্থায় স্থিতিলাভ হয়। জপের পূর্ণ পরিণতির ফলে এই আত্মবিকাশ অবস্থা প্রকট হইয়া থাকে। জপ ক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি এইখানেই জানিতে হইবে। ইহা ক্রিয়াযোগ নহে, কিন্তু ক্রিয়াযোগের পরিণতিরূপ ফল।

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা—প্রার্থনা

মোরা চাহিতে জানিনা দয়াময়,
চাহি শুধু ধন জন আয়ু সৌভাগ্য বিজয়।
করুণার সিন্ধুকূলে বসিয়া মনের ভুলে (মোহে)
এক বিন্দু করে তুলে মুখে নাহি লই।
তীরে করি ছুটাছুটি ধূলি বাঁধি মুটি মুটি
পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই কুড়িয়ে নিয়ে, কি ছাই করি তা দিয়ে,
দু'দিনের মোহ (ভুল) হায়রে ভেঙ্গে চুরমার হয়।
তথাপি নির্লজ্জ মোরা মহাব্যস্ত তাই নিয়ে,
ভাঙ্গিতে গড়িতে হায় হয়ে পরে অসময়।
মোরা জানি নাত মোহ ঘোরে করুণা নির্ঝরণা,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর ঝর বয়।
চিরতৃপ্তি আছে তাহে, না চাহিতে মোহ ভেঙ্গে,
দিও দীনে করুণা-সাগর যাতে চিরপিয়াসা না রয়।

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭২ সন
দুর্গাপুর, হাঁসপাতাল।

চরণাশ্রিত অধম সন্তান—
মোহিনীমোহন সান্ন্যাল

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের দেবদেবীর আরতি আরাধনা

রায়সাহেব মোহিনীমোহন সান্ন্যাল

ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মহাপুণ্য ভূমি ও মহাতীর্থ স্থান এই আনন্দ তপোবন—শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম আনন্দধাম। মহাসাধন পীঠ নির্জ্জনে ৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসন। এই সমেত শিখর আনন্দধামে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত।

এই মহাপুণ্য ভূমির মৃত্তিকা স্পর্শে মানুষ সদ্ভাবে ভাবিত হয়। মনের কলুষ নাশ হয়। ভগবৎ প্রেমের উন্মেষে আকুল করে প্রাণ। উদ্দীপনা আসে ভগবৎ দর্শনের। এই আনন্দ তপোবনের গাম্ভীর্য্য আনে একটি আশ্চর্য্য অজ্ঞাত অনুভূতি। উদ্বেল হয়ে উঠে সমস্ত অন্তরের অন্তঃস্থল। এই আনন্দধামে আনন্দলোকে আনন্দ আর আনন্দ। নিরানন্দের লেশ মাত্রও নাই।. এই পুণ্যতীর্থেই ঝড়পূর্ণ জগত-সংসারের শান্তির নিবাস শান্তি নিকেতন। এখানে অবস্থান করিলে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত আরও নিবিড় পরিচয় হয়। তাঁহার নিত্য সচ্চিৎ দেহেতে সাধক সন্তানের সমস্ত পাপ ও অজ্ঞান ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতেছে ও সাধক শিষ্যের তাঁহার চরণকমল ধ্যানে তাহা

সম্পূর্ণ ভাবে দূর হইতেছে। আরও সার্থকতা আছে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণকমল নিয়ত বন্দনা করিলে গুরু-শিষ্যের মধুর সম্বন্ধ, মধুর মিলন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আনে আত্মদান-আত্মসমর্পণে আত্মতৃপ্তি। শুধু আশ্রম সেবা করিলেই পূর্ণানন্দে ডুবে যাবে।

সন ১৯৬৪, ৩১শে মার্চ্চ, রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে ভোগ আরতি আরম্ভ হয়েছে। শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টার ধ্বনিতে দিক মণ্ডল ধ্বনিত। বাতাসে ধূপের গন্ধ, চন্দনের সুবাস, গুগ্‌গুলের মন্দ গন্ধে সমস্ত আশ্রম (তপোবন) মুখরিত। ঘণ্টা হইতে অনন্তের ধ্বনি নিনাদিত, হৃদয় তন্ত্রীতে অনুরণিত হয় এক মধুর ঝঙ্কার, প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে আনন্দের নব জাগরণে।

আমি ৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসনে জপ শেষ করিয়া বিজ্ঞান মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণকমল বন্দনা করিতে প্রবেশ করেছি। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শয়ন ঘরে দ্বিতলে আলো জ্বলিতেছে। সুমধুর সংগীতের স্বর শুনা যাইতেছে। চরণকমল বন্দনা শেষ করিয়া উপরে যাবার সিঁড়িতে একটু দাঁড়াইলাম। সংগীত শুনা যাইতেছে ওঁ ঋতং ত্বমচলোশ্চ (?)—বুঝিতে পারিলাম না সব টুকু। সমস্ত বাতাবরণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে সেই অপূর্ব্ব সংগীতে। বরষিছে দিব্য শান্তি সুধারস। সংগীতের মোহনশক্তিতে সমগ্র চেতনা সমস্ত অনুভূতি লুপ্ত প্রায়। মন পৌঁছে গেল কোন অতীন্দ্রিয় লোকে।

জয় জয় শ্রীগুরু আরতি তোমার। জয় জয় গুরু আরতি

তোমার। শিব শিব আরতি তোমার। সমস্ত আকাশ বাতাস হয়ে উঠেছে শিবময়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জ্যোতির্ম্ময় মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখাচ্ছেন মূর্ত্ত মহেশ্বর সদাশিব। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পবিত্র আরতি ধ্বনি যতদূর পৌঁছাচ্ছে ততদূর কীট পতঙ্গ সব যেন মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। দূরে ৺নবমুণ্ডী প্রাঙ্গণ সমীপে দাঁড়ায়ে দূরদর্শী, জীর্ণকায়, জটাজুট শিব শমীবৃক্ষ (ঋষি) কোন এক বিরাট পুরুষের ধ্যানে অবিচল, দেহ নির্ব্বাক। শাখা প্রশাখা বিস্তার করে ৺নবমুণ্ডীর প্রাঙ্গণে "মধু" বর্ষণ করিতেছে, যেন সেই অনাগত বিরাট পুরুষকে সুস্বাগত জানাইতেছে।

মানসলোকে ভেসে উঠিল শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশ তেজোময় কল্যাণময় রূপ শ্রীশঙ্কর সদাশিব (শ্রীশ্রীগুরুদেব) চিরসুন্দর। ছুটে গেলাম শিব মন্দিরে, দেব-মন্দিরে পরম দেবতা মহেশ্বরের চরণে ঢেলে দিতে হৃদিনৈবদ্য, দেবীর চরণে নিবেদন করিলাম প্রাণের আকুল কান্না ও অশ্রুজল। আজ মনে প্রাণে শান্তির উদ্বেল আনন্দ। চিরকাল আনন্দ যেন এইরূপেই থাকে। এখনও মৃত্যু তুচ্ছ করে জানিতে বাকী যিনি চিরউজ্জ্বল। চাই পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

হেরিলাম আজ আমি
পুণ্য বিমল এই বিশুদ্ধ কাননে (তপোবনে)
পরিজন তরুলতা, মূর্ত্ত পবিত্রতা
স্নেহ ভালবাসা একি মমতা
ব্যাকুল করিছে মন স্নেহ আকর্ষণে।

২৯শে ফাল্গুন সন ১৩৭১ সাল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব

দিবসে আমরা কায়মনবাক্যে স্মরণ করিতেছি তাঁহাকে—বন্দনা করিতেছি মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের মর্ম্মর মূর্ত্তি। চরণে ঢেলে দিতেছি অশ্রুজল। স্তব করিতেছি—

আর কত কাল পথ পানে মোরা
নিয়ত রহিব চাহিয়া,
কাঁদিছে আশ্রম, শূন্য সিংহাসন,
এসো এসো দয়াময় নামিয়া।
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে
চেয়ে আছে সন্তান তব পথ পানে।
এসো এসো এসো গো হেথা স্থূলেতে ফিরিয়া।
সর্ব্বজন সুখ তুমি সর্ব্ব আত্মাময়,
দুঃখেতে সান্ত্বনা তুমি, বিপদে আশ্রয়।
আজি এই মাঙ্গল্য মহামিলন উৎসবে
নাহি শুনো মঙ্গল বাদ্য ? তুমি যে নীরব।
হে দুঃখহারী পরমাত্মা সনাতন পরম ঈশ্বর,
যে কারণে তব অবতরণ
সেই কর্ম্ম পুনঃ হবে সাধন তব আগমনে।
হে লীলা তনুধারী পরম ব্রহ্ম পরাৎপর পরম শিব,
তব অবতরণ কেন অসম্ভব বলি মনে ভাবিতেছি তাই।
শ্রীশ্রীগুরুদেবের মর্ম্মর মূর্ত্তি হতে উঠিল যে বাণী
অসম্ভব ? না, না, না।
সন্তানের সংকল্প বিকল্প স্বভাব,
তাই অজ্ঞানের মোহতে আকর্ষিত হয় স্বভাবের পানে।

শ্রীগুরুদেবের স্থূলদেহে আবির্ভাব আমাদের জীবনে সত্য হোক, নিত্য হোক। তিনি শুধু আমাদের নহেন, তিনি বিশ্ব মানবের। তাঁহাকে আমরা নিজেদের মধ্যে পাইয়াছিলাম জীবন্ত বিগ্রহরূপে, ইহাই আমাদের গর্ব্ব। এই গর্ব্ববোধের প্রয়োজন রহিয়াছে, কারণ এই অনুভূতিরই প্রবাহে আমাদের সমস্ত জীবনের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সমুন্নতি নির্ভর করিতেছে, বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনায়। তিনি প্রত্যক্ষের আদর্শ।

জয় গুরু, জয় গুরু—
হে মোর দেবতা প্রভু।
মম চিত্ত মাঝে প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার
আঘাতে আঘাতে কর মহান উদার।
শক্তি মোরে দেহ প্রভু যেন চিত্ত মম
মানবে বরিতে পারি মম ভ্রাতা সম।

২১শে আশ্বিন ১৩৭৩ সাল
শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম
(তপোবন) মালদহিয়া।

শ্রীচরণাশ্রিত অধম সন্তান
মোহিনীমোহন সান্যাল

নীলকণ্ঠানন্দ পদাবলি

(পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, গীতানিধি।

শ্রীমৎ শ্রীনীলকণ্ঠানন্দ তীর্থস্বামী পরমারাধ্য শ্রীমৎ শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহোদয়ের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। পরমহংস মহোদয়কে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, যদিও তিনি আমার দীক্ষার পর বৎসরাধিক কাল দেহে ছিলেন। তবে মদীয় গুরুদেব তীর্থস্বামী মহোদয় হইতে পরে পরম গুরুদেব সম্বন্ধে কিছুটা জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বিস্তারিত ভাবে জানিয়াছিলাম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রণীত "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত "যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" হইতে।

মদীয় গুরুদেব শ্রীযুত তীর্থস্বামী মহোদয়ের গৃহীনাম ছিল শ্রীহরমোহন ভট্টাচার্য্য। তাঁর বিষয় শ্রীযুত দত্তগুপ্ত মহাশয় তাঁর উক্ত পুস্তকে একজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন যোগী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে একজন প্রেমিক যোগী ভাবেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং মহাজনোচিত অনেক কিছুই তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যা হোক, তাঁর শিক্ষা প্রণালী ছিল অতীব সংক্ষিপ্ত। প্রদত্ত "ক্রিয়ার" উপরই তিনি আমাদের

মনোযোগ দিতে বলিতেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার স্ব-রচিত গানগুলি শুনাইতেন। নিম্নলিখিত গানগুলি হইতেই অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন তিনি সত্যই "মহাজন পদবাচ্য" ছিলেন কিনা।

এই মহাপুরুষের দেশ ছিল ফরিদপুর জিলায় গোঁসাই হাট থানায়। তাঁর পৈত্রিক ভদ্রাসন এক্ষণে মেঘনা-গর্ভে। বাল্য-কালেই তিনি কুচবিহারে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষাদি করেন এবং দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়া যজন যাজন ক্রিয়ায় বিশেষ পারদর্শী হন। শক্তি পূজায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা তৎকালেই প্রকাশ পায়। তাঁর জন্ম সন তারিখ ইত্যাদি এক্ষণে পাইবার কোন উপায় নাই। তিনি ঠিক কোন সময় পরম গুরুদেব শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহোদয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা কাহারও জানা নাই। এই মহদাশ্রয় প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর তিনি স্বতন্ত্র ভাবেই ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হন এবং ঢাকা জিলায় মীরকাদিমে (কমলাঘাট) এবং পরে বর্দ্ধমান জিলায় পূর্ব্বস্থলী থানা মধ্যে পীলাগ্রামে দুইটি "শ্রীগুরু-আশ্রম" স্থাপন করেন। উভয় আশ্রমেই তাঁর লীলা প্রকট হয় এবং বহু শিষ্য তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঙ্গ বিভাগের পর মীরকাদিম আশ্রমটি এক রকম উঠিয়া যায়। তখন হইতে পীলা আশ্রমটি তাঁর প্রচার কার্য্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হয়। বিগত ১৩৫৭ সালের ১লা বৈশাখ পীলা আশ্রমে ব্রহ্মযোগে তিনি ক্রিয়াগৃহে আসনে বসিয়াই দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার শিষ্য সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল জিলা ছাড়াও, বিহার প্রদেশ এবং কুচবিহার রাজ্যেও তাঁহার শিষ্যমহাল পরিব্যাপ্ত। তাঁহার শিষ্য মধ্যে বিচারক, উকীল, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সরকারী ও বে-সরকারী অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন মধ্যবৃত্ত এবং সাধারণ স্তরের অনেকেই আছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে দুই চারিজন বেশ ক্ষমতাও অর্জ্জন করিয়াছেন।

বাহুল্য ভয়ে এবংবিধ মহাজন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান হইতে নিরস্ত হইলাম। নিম্ন উদ্ধৃত গীতাবলিই তাঁহার পরিচয় চিরদিনের জন্য বহন করিবে। এখানে কয়েকটি মাত্র গান উদ্ধৃত হইল, এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, বৃন্দাবন তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যে গানগুলি আছে তাহা ভাবে ও ভাষায় এবং তাত্ত্বিক মূলোদ্‌ঘাটনে অন্যান্য মহাজন পদ হইতে কোন অংশে ন্যূন ত' নহেই, বরং অধিকতর সমৃদ্ধ।

"সদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"—এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সর্ব্বশেষে এই দীন লেখক নিবেদন পাইতেছে যে,—

মহাজন পদ দিয়া সেব মহাজন পাদ।
সংসার নিবৃত্ত হবে ঘুচি' যত পরমাদ॥

ওঁ তৎসৎ

—"সদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"—

(১)

শ্রীগুরু বিনে এ তিন ভুবনে
জীবনে মরণে আর কেহ নাই।
গুরু দিলে পাই, না দিলে না পাই,
বাঁচালে বাঁচি, মারিলে মরি যাই।
গুরু হরিহর ত্রিলোক ঈশ্বর
গুরু জগত গোঁসাই ;
গুরু পরম ধন জীবের জীবন,
গুরু নাম নিয়ে ব'সে থাক ভাই।
দ্বিজ দীন হীন বলে, শ্রীগুরু কৃপা বলে,
গুরু নামে ডঙ্কা মেরে শমন ভয় এড়াই।

(২)

জয় শ্রীবিশুদ্ধানন্দ নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন।
সনাথ শ্রীভোলানাথ বিশ্বনাথ শ্রীসনাতন ॥
মৃদু মলয় পদ্মগন্ধ বহিতেছে সর্ব্বক্ষণ।
ছুটিছে অলি ভকতবৃন্দ করিতে সে মধু অন্বেষণ ॥
কিবা বিভূতি ভুষণে শোভা মুনিজন মন লোভা।
ঐ শ্রীপদেতে বিরাজিত মম মানস রতন ॥
ধরাধামে অবতীর্ণ পাপী তাপী উদ্ধারিতে,
বর্ণাশ্রম আচার ধর্ম্মের বিশেষ বিধি রক্ষিতে,

ঋষি বাক্যের করিয়ে রক্ষা গুরু ভকতির দিয়ে শিক্ষা,
সুকৌশলে দিয়ে দীক্ষা বিতরি' অমূল্য ধন ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অভীষ্ট সাধনে,
যার যেই কুলধর্ম্ম রাখিতে হয় সযতনে ;
হেথা বাক্ বিতণ্ডার নাই অপেক্ষা,
কেবল শুদ্ধ সত্ত্বের হয় পরীক্ষা,
ও সেই ব্রহ্মণ্যদেব শোভিত নমি' সেই ব্রাহ্মণগণ ॥
শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে দ্বিজ দীন হীনের স্তুতি,
ঐ কৃপা বিনা আর নাই অন্য কোন সঙ্গতি ;
ভাই ভগিনীগণ সন্নিধানে প্রার্থনা করি এক্ষণে,
এস সবে মিলে ঐ চরণে হবো গিয়ে নিমগন ॥

(৩)

রাখ সদানন্দে ভ্রাতৃবৃন্দে গুরুপদে মন ।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু দীনতারণ ॥
পরব্রহ্ম পরাৎপর নিত্যশুদ্ধ সনাতন,
সাকারে সাকাররূপী নিরাকারে নিরঞ্জন ॥
কি দিব তুলনা তার তুলনা কি মিলে তার,
যে নাম স্মরণে জীবের ভব ব্যাধি হয় মোচন ॥
বেদবেদান্ত যাঁর স্বরূপ বর্ণিতে নারে,
অবাঙ্‌ মনসগোচর ব্রহ্মাদির' অগোচরে,
বিশুদ্ধ আনন্দ তাঁর বিশুদ্ধ স্বরূপ ;—
সেই পদে, পদে পদে মজরে মন দিবানিশি,

যে পদ সম্পদ ভেবে শঙ্কর শ্মশানবাসী ;
দূরে যাবে অষ্টপাশ, অবিদ্যা হবে বিনাশ,
জ্ঞানের প্রকাশে তখন, দেখিবে হৃদয়ের ধন ॥
আজি শুভদিন এই মিলিত মহাউৎসব,
প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে করবে সেই নামরব,
পুলকে হইবে পূর্ণ সবার হৃদয় ;—
শ্রীগুরু কৃপা বলে দ্বিজ দীন হীন কয়,
ভক্তিযোগে বল সবে শ্রীগুরু শ্রীগুরুর জয়,
আর রবে না ভয় ভাবনা, দূরে যাবে ভয় ভাবনা,
শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ্মে করবে আত্মসমর্পণ ॥

(এই গানটি পরম গুরুদেবের কোন জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে রচিত হয় ।)

(৪)

[ভৈঁরো—একতালা]

চরণ গুরু ধ্যান-মগন রহু জগবাসী ।
গুরুজ্ঞান রাখ সদা ভকত রস পিয়াসী ॥
শিরসি গুরু সদা বিরাজ',
মূলা অধো দেশ রাজ,'
মিলি' ব্যোম ধরা দোঁহে নাশ' তমোরাশি ॥
দ্বিজ দীন হীন গুরু সেবন,
কমল-ষট্-বন-রমণ,

করত সদা নাম জপন
বিশুদ্ধানন্দ হৃদয় বিকাশি' ॥

—আত্ম-সমর্পণ—

(৫)

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"

[১]

গুরু গুণাকর, প্রাণের ঈশ্বর,
ধর ধর ধর, (এ) অধমের ভার।
(এ) অকুল পাথার, ভব পারাবার,
(প্রভু) তুমি বিনে আর কে করে নিস্তার ॥

[২]

বলি হে সম্প্রতি, বিতর সুমতি,
সদা ভয় ভীতি, এ চঞ্চল মতি,
ত্রিতাপ সন্তাপে, সদা মনস্তাপে,
তাইতে তনু কাঁপে, কর হে উদ্ধার ॥

[৩]

সংসার চক্র অতি, কুটিল বক্রগতি,
স্থির নহে মতি, সদা ইথি উতি,
কিসে হবে রতি, তব পদে মতি,
(আমার) কুসংসর্গে গতি, না হয় যেন আর ॥

[৪]

অন্তর্য্যামী তুমি, আছ হে অন্তরে
না বুঝে অন্তরে, ভাবি যে অন্তরে,
অন্তরে বাহিরে, যে জন নেহারে,
এই ধরা প'রে, সে হয় তোমার ॥

[৫]

ক্ষীণ প্রায় তনু, কি করি কি করি
ক্ষণে মনে করি, তব নাম করি,
মোহ মায়া ঘোরে, যাই হে পাশরি,
ওহে কৃপা করি, তুলে লও এবার ॥

[৬]

মন প্রাণ ভোলা, রূপ সুধা ধার,
দেখার মত দেখা পাব' কি এবার
(আমায়) করো না বঞ্চনা, দিও না লাঞ্ছনা,
(তোমার) বিরহ যাতনা, কত সব আর ॥

[৭]

ওহে কর্ণধার, ব'লে হে পাশরি'
ডুবু ডুবু প্রায়, হলো জীর্ণ তরী,
দয়াময় যদি, না রাখো আবরি'
(তবে) নাম অপযশ, হবে হে তোমার ॥

—দেহ-তত্ত্ব—

(৬)

দেহ রূপ-নগরে কে কোথা কি করে,
একবার তত্ত্ব ক'রে দেখ তারে মন ।
মায়া-মুগ্ধ হ'য়ে কু'তত্ত্বে মজিয়ে,
থেকো না তাহারে হ'য়ে বিস্মরণ ।।
অশ্বিনীকুমার নাসার অধিপতি,
চোক্ষে অর্ক চর্ম্মে বায়ুর বসতি,
কর্ণেতে দিক্‌পাল করেন অবস্থিতি,
পায়ুমূলে মিত্র বসে অনুক্ষণ ।।
বাগিন্দ্রিয় বহ্নি করিছে চালন,
প্রচেতা তাহাতে করেন আস্বাদন,
পাণিতে দেবেন্দ্র, পদেতে উপেন্দ্র,
উপস্থেতে ব্রহ্মা করেন সৃজন ।।
মহৎতত্ত্বোৎপত্তি ভগবদ্বীর্য্য হ'তে,
ত্রিধা অহঙ্কার জন্মাইল তাতে,
সাত্ত্বিক বিকার হলো মনস্তত্ত্বে,
প্রপঞ্চ কামরূপা বৃত্তি যার লক্ষণ ।।
মহৎ সেবায় কর দম্ভ পরাজয়,
শুদ্ধ চিত্তে লও সদ্‌গুরু আশ্রয়,
দেহ মন দাও সঁপি' সেই পায়,
হবে প্রেমোদয় জনম বারণ ।।

(৭)

কালী ব'লে কালী মাকে, কাল মনে ক'রোনা।
সে ভাবে ভাবিলে কালী, কালের ভয় ত' যাবে না ॥
এ জগৎ কালে মিশে, কাল হয় 'মহাকালে' লয়,
সে 'মহাকাল' যাতে মিশে, বেদে তারে কালী কয়;
কল্পান্ত বৈ সে রূপ মা তো ধরে না ॥

বাকী তার দেখে বহুকাল, রুদ্ররূপী সেই 'মহাকাল,'
তলায় স্থান দেহ ব'লে প'ড়ে আছে, কেন তাই দেখ না ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত, নানা বর্ণ করয়ে এক,
সকল ঘুচে কাল বর্ণ, হয় কিনা হয় সেটি দেখ,—
তা' হ'লে মা কাল কিসে যাবেরে জানা ॥

এই যে বিচিত্র ভুবন, একত্রে হয় চূর্ণ যখন,
অন্ধকার প্রকৃতি তখন, তাই কাল রূপ 'কল্পনা' ॥
অজ্ঞানীর তামস ধ্যানে, মা আমার কাল বরণী,
জ্ঞানীর চোক্ষে রুদ্রাণী মোর দিব্যজ্যোতি স্বরূপিণী,—
প্রাণ মন যোগে তারে ভাবনা ॥

নইলে রবি লোমকূপে যার, বর্ণ কি তার অন্ধকার
জেনে শুনে দীন হীন তোর মনোবিকার গেল না ॥
*('ক' বা 'হ' কার, রেফ্, বিন্দু যোগে ভাবনা—পাঠান্তর)

(৮)

মা তুমি আমার মা, ছেলের মা, বাবার' মা,
এত মা'য় অত মা'য় কাজ কি,—মোটের উপর সবারি মা।

কুমারী কৌমারী বালা, কিশোরী ষোড়শী শ্যামা,
ত্রিজগৎ-প্রসবিণী, জগদ্ধাত্রী গৌরী উমা।
কভু রাজরাজেশ্বরী, অন্নপূর্ণা সংসারের মা,
প্রবীণা জরাজীর্ণা, অতিশীর্ণা বৃদ্ধা ধূমা।
ভূষণে বিভূষিতা, রাজদুহিতা অনুপমা,
শ্রীহট্ট বিলাসিনী, সুহাসিনী সুররমা।
গোপিনী মালিনী গো মা, সুশুচি শুণ্ডিকা ভূমা,
শিবের মা শিবরমা, শিবের মা, কি গণেশের মা,
শিবের মা শিবের কোলে, ভুলে তাই গণেশ বলে মা।

(৯)

দেখরে মা দশভুজা, নির্ভুজা অনন্তভুজা
আনন্দ কাননে হের, পরমানন্দদায়িনী।
মহাশক্তির আরাধনায় বোধনাদির আয়োজন,
অনুষ্ঠান ক্রমে কভু হবে না তার উদ্বোধন ;
সদ্‌গুরু কৃপাবলম্বনে যোগতত্ত্বানুসন্ধানে,
(কেবল) ডাক তারে নিশিদিনে, দুর্গে দুর্গতিহারিণী ॥
আত্ম চেতনাতে হবে চৈতন্যময়ীর প্রকাশ,
জীবন্যাস মন্ত্রে কভু, চৈতন্য হ'বে না তার ;
অকৌশলে শৈলসুতা, না হয় কারো বশীভূতা,
সে যে সর্ব্ব আদ্যা সর্ব্বারাধ্যা, সর্ব্বতত্ত্ব স্বরূপিণী ॥
শক্তি উপাসনার ছলে, দ্বিজ দীন হীনের মন,
আত্মবিদ্যা গুরুতত্ত্বের করিয়ে অনুসরণ,

জাগাও কুলকুণ্ডলিনী, জাগিবে জগজ্জননী,
(সে যে) অখণ্ডানন্দদায়িনী, চিদানন্দ স্বরূপিণী ॥

(১০)

(মন তুমি) 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌ছ' ব'সে কারে ?
মায়ের সঙ্গে নাইক' দেখা, কি ফল হবে পূজা ক'রে ?
ফল মূল কি নৈবেদ্যে, পূজিলে মহামায়ায়,
তুষ্ট হ'য়ে ইষ্টরূপে, দেখা কি দেবেন তোমায় ?
না পাইলে সুকৌশল, সে পূজায় নাই কোন ফল,
যার পায়ে চতুর্ব্বর্গের ফল, ধরগে তাহারে ॥
সদ্‌গুরুর আশ্রয় ল'য়ে, দিনান্তে বসিয়ে ডাক,
কালাকাল শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নাই জেনে রাখ,
(ও সে) নিত্য বস্তু সদা বিদ্যমান ;—

যোগাসনে ব'সে ধ্যানে, যে জন মা ব'লে ডাকে,
দয়া ক'রে দয়াময়ী, সদয়া হইয়ে তাকে,
গুরু কৃপারূপী হ'য়ে, অসাধ্য দেন তার সাধিয়ে,
জঠর কঠোরে কভু আস্‌তে হয় না তারে ॥
অভয়ে অভয়ার পদে সঁপিয়ে দাও প্রাণ মন,
সর্ব্বমঙ্গলকারিণী করিবে সদা কল্যাণ,
সে বিনে আর গতি নাই ভবে ;—

অনন্ত ব্রহ্মরূপিণী সদানন্দ প্রদায়িনী,
মহাকাল মনমোহিনী চিদানন্দ স্বরূপিণী,

অনাদির আদির আদি, ভজ তারে নিরবধি,
অখণ্ড জ্ঞানরূপে সে সদা বিরাজ করে ॥
দ্বিজ দীন হীন বলে অন্ধ বিশ্বাস করে যারা
অনন্ত ঘোর বিপাকে, ভব ঘোরে ঘুরে তারা ;
মানব জনম বৃথা করে গত ;—

চৈতন্য পুরুষের দয়া পেতে পারলে কোন কালে,
চৈতন্যময়ী জননী, তখন এসে নেবেন কোলে,
মার ছেলে মার কাছে থাক্‌বে, সদানন্দে কাল কাটাবে,
নিত্যানন্দ ধামে যাবে দেখিবে তাহারে ;
(ওরে) আর রবে না নিরানন্দ পাইলে তাহারে ॥

(১১)

আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে. চলনা আপন অন্তরে.
(তুমি) বাহিরে যার তত্ত্ব, কর অবিরত সেত' সহস্রারে বিহরে।
বামে ইড়া নাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলা, রজস্তমঃ লয়ে করিতেছে খেলা,
মধ্যে সত্ত্বগুণে সুষুম্না বিমলা, ধর ধর তারে সাদরে ॥
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বায়বী আকারে, অচৈতন্যরূপে আছেন
মূলাধারে,
গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনার জোরে, চেতন কর না তাহারে ॥
মূলাধারাবধি পঞ্চচক্র ভেদি, সহস্রারে যদি থাক নিরবধি,
তখন দেখিবে সে নিধি, দূরে যাবে ব্যাধি, ভাসিবে আনন্দ
সাগরে ॥

ইন্দ্রিয় সঙ্গেতে হ'য়েছে প্রমত্ত, সদ্‌গুরু চরণে হওরে আশ্রিত,
তোমার মোহ দূরে যাবে লভি' আত্মতত্ত্ব, ত্বরায় তরিবে সংসারে ॥

(১২)

কিসে যাবে সহস্রার।
স্বাহা স্বধা, বষট্‌, বৌষট্‌ ফট্‌কার যোগে,
দারুণ ষট্‌চক্র হইতে নারিবে পার।
মূলাধার ভোগবতী পুরী প্রায়,
সাপিণী প্রহরী শুয়ে নিদ্রা যায়,
স্বাধিষ্ঠানে বাদী অপার বারিধি,
নাহি তথা তরী নাহি কর্ণধার ॥
(তুই) যাবি কবে সহাস্তে, মণিপুরী রাজ্যে,
অগ্নিময় তুর্গম অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা মায়া নিদ্রা আর আলস্য—
পাঁচের ক্রিয়া সেথা সমান রয়।
অনাহত যায় বহেরে অস্থির বায়ু,
প্রতিক্ষণে তথা পরীক্ষা হয় আয়ু,
বিশুদ্ধতার শেষ, শূন্যময় দেশ,
আধার আশ্রয় তরীর নাই বিলয়।
আছে চন্দ্রলোকের বামে পিতৃযান নামে,
সূর্য্যলোক তুর্গ অতি ভয়ঙ্কর ;
দক্ষিণে দেবযানে "সোহহং" তত্ত্বজ্ঞানে
যোগিগণ যাতে যান।

দ্বিজ দীন হীন কয় মন যদি যাবি সেই পথে,
কর আরোহন প্রণব পুষ্প রথে,
নইলে রে অজ্ঞান, মিছে ধ্যান জ্ঞান,
মিছে যম জয়ের অহঙ্কার ॥

(এইরূপ খান পঞ্চাশ গান বিভিন্ন তত্ত্ব সম্বলিত পূজ্যপাদ গুরুদেবের নিকট হইতে আমার সংগৃহীত আছে। "বিশুদ্ধবাণীর" যোগ্য বিবেচিত হইলে, সেগুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইতি—লেখক।)

श्री श्रीं परमहंस विशुद्धानन्द जी की जागृत कृपा

पं० चन्द्रशेखर स्वामी एम० ए०

मुझे बाल्यकाल से साधु सत् पुरुषों के सान्निध्य में रहने का सुयोग मिला। घर का वातावरण धार्मिक ही रहा अतएव सदैव सत्पुरुष साधुमहात्माओं के प्रति मेरा स्वाभाविक आकर्षण है।

१९५७ की बात है। मेरे मित्र श्री शिवकुमार देव* जी म० म० पं० गोपीनाथ कविराज जी के पास आते जाते रहे। मैंने बचपन में कल्याण में कायसिद्धि नाम का लेख पढ़ा था। उसी दिन से उनका दर्शन करने की इच्छा रही, किन्तु उनके महान् व्यक्तित्व के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन मैंने अपने मित्र से अनुरोध किया कि मुझे भी कविराज जी के पास ले चलें। उन दिनों मेरे मित्र श्री शिवकुमार देव जी श्री श्री †प्रभुदेव वचन का अनुवादकार्य कर रहे थे। एक दिन

---

* श्री शिवकुमार देव जी आजकल बेंगलोर एवं सिरियाल कोप्प विरक्त मठ के महंत हैं।

† प्रभुदेव—वीर शैव सम्प्रदाय के एक संत हुए हैं। यह बारहवीं शताब्दी में अनुभव मण्डप के अध्यक्ष रहे। यह एक विशिष्ट शिवयोगी रहे हैं। इनकी वाणी 'कन्नड़' में वचन कही जाती है।

उनके साथ श्री कविराज जी का दर्शन करने गया। कविराज जी को प्रणाम करके पार्श्व में रखे चित्र की तरफ देखा। उस चित्र में दाढ़ी वाले बाबा का चेहरा है। वे शान्त भाव से एक आराम कुर्सी पर बैठे हैं। जब मैंने उस चित्र में उनकी आँखें देखीं तो बड़ी तेजस्वी मालूम पड़ीं। उस चित्र के प्रति मेरा बहुत आकर्षण हुआ। साथ ही साथ ऐसा अनुभव हुआ कि यह चेहरा कहीं देखा है, किन्तु मैंने कभी इस प्रकार का चित्र कहीं देखा नहीं था।

घर लौटते समय मैंने मित्र से उस चित्र के प्रति पूछा—यह चित्र किसका है ? तब मेरे मित्र ने कहा "यह श्री श्री कविराज जी के गुरु जी का है, और उनका नाम श्री श्री योगिराज विशुद्धानन्द परमहंस है।" उनकी संक्षिप्त जीवनी भी कह डाली। उनका अलौकिकशक्तिसंपन्न जीवन काल्पनिककथा की तरह लगा।

कुछ दिन के बाद Paul Brunton की Search in Secret India किताब पढ़ने को मिली। उसमें बाबा जी की अलौकिकशक्ति का वर्णन पढ़कर बहुत चकित हुआ।

कभी कभी बीच बीच में कविराज जी का दर्शन करके तत्त्व की बातें सुन लेता था। १९५८ में मैं दर्शनशास्त्र लेकर एम० ए० अन्तिम वर्ष में अध्ययन कर रहा था। उन दिनों अन्तिम वर्ष में दो पेपर्स के बजाय प्रबन्ध लिखने की सुविधा रही। श्री प्रो० शिवरमन जी ने "शिवाद्वैत दर्शन" पर प्रबन्ध लिखने को कहा। कश्मीर शैवदर्शन के बारे में प्रथमतः लिखना था।

इस विषय की कुछ किताबें लाकर पढ़ने लगा, कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत दुःख हुआ। वेदान्त की किताबें कुछ गुरुमुख से पढ़ी थीं, किन्तु प्रत्यभिज्ञादर्शन की एक भी किताब समझ में नहीं आयी। प्रो० शिवरमन ने कविराज जी के पास जाकर इनको पढ़ने के लिये कहा। पूज्य कविराज जी के पास गया। वे उस समय शास्त्र चर्चा में मग्न रहे। मैं भी बैठकर सुनने लगा। पुनः दूसरे दिन गया। प्रत्यभिज्ञाहृदय पढ़ाने को राजी हो गये और कृपा करके पढ़ाना आरंभ किया।

एम० ए० उत्तीर्ण होने पर शैवशास्त्र की जिज्ञासा पुनः कविराज जी के पास ले गयी। धीरे धीरे श्रद्धेय पूज्य कविराज जी का विशेष सम्पर्क हुआ। वे रोज पाठ पढ़ाते थे। मैं उनसे पढ़ने लगा। किसी किसी सन्दर्भ में बाबा जी की अलौकिक-शक्ति का वर्णन एवं सूर्य-विज्ञान की बात सुनता रहा। धीरे धीरे बाबा जी के बारे में मेरे मन में श्रद्धा बढ़ने लगी। कभी कभी मन में यह आता था कि कितना अच्छा होता यदि मैं उनके जीवितकाल में ही यहाँ आया होता। कभी कभी श्री पूज्य कविराज जी के साथ मलदहिया स्थित श्री श्री विशुद्धानन्द कानन, भी जाता रहा। वहाँ पर बाबा जी के शिष्यों की कविराज जी के साथ बाबा जी के दर्शन एवं अनुभव के बारे में बातें होती थीं। मेरे मन में यह प्रश्न उठने लगा कि श्री बाबा जी मायिक शरीर को त्यागने पर भी अपने अलौकिक शान्त शरीर में रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।

मैं प्रत्येक बात बुद्धि द्वारा विचार करके मानने वाला व्यक्ति हूँ। अतएव मेरे मन में यह प्रश्न उठने लगा कि इनका दर्शन यदि होता हो तो किस प्रकार होता होगा, इस प्रसंग में मैंने श्री कविराज जी महाराज से बातें कीं। नाना प्रकार के शंका समाधान होते रहे। वे शान्त भाव से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते थे और इस तरह बातें ठीक बैठने लगीं।

इसी बीच में श्री कविराज जी के पास एक पढ़े लिखे नवयुवक लखनऊ से आये। वे बाबा जी के बारे में बातचीत करने लगे। उनकी बातचीत से पता चला कि उनको भी श्री बाबा जी का दर्शन होता है। वे उस समय किसी कालेज में प्राध्यापक थे। उनसे मैं मिला और पूछा कि आपको किस प्रकार दर्शन होता है और सुगन्ध का अनुभव कैसे हुआ इत्यादि। प्रश्न पूछने पर भी वे संकोचवश कुछ नहीं बता पाये। केवल इतना कहा "यह सब बाबा जी की कृपा है"। उस दिन मैं रातभर यही सोचता रह गया कि दर्शन किस प्रकार होता है। वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है जिसे बाबा जी का दर्शन होता है।

कुछ दिन बाद श्री कविराज जी महाराज के साथ सिद्धदेह एवं उनका स्वरुप आदि विषयों पर चर्चा चली। उससे मेरे मन में यह दृढ़ निश्चय हुआ कि सिद्धदेहसंपन्न व्यक्ति सदैव अपने सिद्धदेह के साथ शून्य में हैं। कुछ सिद्ध अकेले शून्य में घूमते हैं। कुछ सिद्ध अपना मण्डल बनाकर शून्य में रहकर जगत्कल्याण की कामना से आज भी अपने महाकार्य में लगे

हैं। कभी कभी कृपा करके संसारी जीवों को दर्शन भी दे देते हैं और संसार के पीड़ित जीवों का उद्धार करते हैं।

मेरी जिज्ञासा इस विषय में और बढ़ने लगी। कविराज जी से बाबा जी की जीवनी सुनने को मिली। बाबा जी के प्रति प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ने लगी। उनके प्रति मेरा हृदय व्याकुल हो उठा।

जाड़े के दिन में श्री कविराज जी महाराज अपने घर के सामने स्थित रथयात्रा के मैदान में टहलने जाया करते थे। उस जगह एक कोने में कुछ गन्दगी रही। तब मैंने कहा, महाराज यहाँ पर गन्दगी है। बार बार कहने पर भी उसका जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण में उसी जगह मुझे एक विलक्षण सुगन्ध का अनुभव होने लगा। उस सुगन्ध का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। तब मुझे लगा कि यह बाबा जी के सान्निध्य से आने वाला पद्मगन्ध है। आगे चलकर इस प्रकार कई बार सुगन्ध का अनुभव हुआ और तब मेरी यह दृढ़ धारणा हुई कि श्री कविराज जी के साथ बाबा जी का नित्य सम्बन्ध है। इसी सुगन्ध के साथ बाबा जी की महिमा छिपी है। इनकी कृपा पाने वाला आज भी पा सकता है। बाबा जी अमर शरीर में आज भी हैं। मैंने सोचा कि मुझ पर भी बाबा जी की कृपा है अतएव मुझे इस पद्मगन्ध का अनुभव हुआ। इससे मन में अपूर्व दृढ़ता आयी।

प्रतिदिन श्री कविराज जी महाराज के पास बैठकर तत्त्व चिन्तन करने लगा। कई बार श्री कविराज जी से लिखित

"श्री श्री गुरुचरणों का प्रथम दर्शन" लेख पढ़ा, इससे बाबा जी के ऐश्वर्य एवं माधुर्यपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे उनके प्रति उत्सुकता एवं श्रद्धा बढ़ने लगी। उनकी प्रत्येक बात सुनने में बहुत अच्छी लगने लगी। इसी बीच श्री कविराज जी 'स्पन्दशास्त्र' को पढ़ाते समय श्री श्री जगदम्बा का स्वरूप क्या है समझाते थे। उठते बैठते मैं उनका स्वरूप चिन्तन करता था। बाबा जी हमारे पास सदैव हैं यह भावना रखकर व्यवहार करता रहा। इससे कभी कभी साधारण सुगन्ध का अनुभव भी होता था।

१९६५ में विजयादशमी का दिन था। श्री कविराज जी महाराज के साथ संध्या समय में मैं मलदहिया स्थित आश्रम गया। वहाँ जाकर मैं श्री श्री माँ नवमुण्डी आसन एवं शिव जी का दर्शन करके बाहर बगीचे में बैठा। उस दिन बाबा जी के सब शिष्य विज्ञान मन्दिर में जाकर बाबा जी के फोटो का दर्शन करते हैं। सब के साथ मैंने भी बाबा जी के फोटो का दर्शन किया। उसके बाद शिव मन्दिर के सामने बाबा जी के सब शिष्य परस्पर आलिंगन करते हैं। सबका परस्पर प्रेम-स्वरूप आलिंगन देखता ही रहा। इतने में श्री कविराज जी महाराज पूछने लगे चन्द्रशेखर कहाँ है ? सीताराम दादा ने मुझे बुलाया तब श्री कविराज जी महाराज ने मुझे अतिकृपापूर्ण आलिंगन किया, उस आलिंगन में क्या आनन्द था यह लिखना कठिन है। यह तो श्री श्री बाबा जी की कृपा थी। रात्रि में आसन पर बैठा तो श्री श्री बाबा जी की वाणी सुनने में आयी। प्रथमतः कुछ

बंगला में रही, उसके बाद हिन्दी में सुनने लगा। उस दिन से जीवन में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ; तभी से बाबा जी की कृपा एवं सान्निध्य पाने का सौभाग्य मिल गया।

१९६६ में कैलासवासी मेरे बड़े भाई श्री शान्तवीर आपया हिरेमठ (एम० ए० हिरेमठ) पं० जवाहरलाल एग्रिकल्चर विश्वविद्यालय में सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर थे उन्हें अचानक हृदय रोग का आक्रमण हुआ, उस समय उनको बाबा जी का दर्शन हुआ, उस समय उनकी रक्षा श्री बाबा जी ने की। मैंने अपने भैया के मुख से सुना था कि जब उनको हृदयरोग से बहुत पीड़ा होने लगी उस समय एक विशाल प्रकाशप्रभामण्डल में श्री श्री विशुद्धानन्द महाराज जी का दर्शन हुआ। उन्हें अन्तिम समय में बाबा जी का दर्शन मिला। वे उनका विशेष विवरण बताना चाहते थे, किन्तु दुर्भाग्यवश उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच न रहा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बाबा जी की कृपा उन पर भी रही। अन्त काल में दर्शन देकर बाबा ने अपने धाम में उन्हें बुला लिया।

मातृ वियोग के दुःख को मिटाने के लिये कई बार बाबा जी ने भैया को मातृदर्शन कराया। उनकी कृपा व्यवहार एवं परमार्थ दोनों दशाओं में सदैव प्राप्त है।

मैं जब सात साल का था उसी समय हमारी कुलपरम्परा के अनुसार मेरी पट्टाभिषेक दीक्षा हुई। हमारी परम्परा का एक प्राचीन मठ निपाणी में है। वह इधर गिर गया था। पूजा

अर्चा सब रुक गयी थी। धीरे धीरे सम्पूर्ण मठ ध्वस्त हो गया। गरमी की छुट्टी में मैं वहाँ गया। मठ की स्थिति देखकर मन में बहुत पीड़ा हुई। आँखों में आँसू आ गये। उसी समय बाबा जी ने कहा 'चिन्ता मत करना। एक साल के अन्दर मठ बन जायेगा।' मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसको बनाने के लिये अर्थ की आवश्यकता थी। मेरा स्वभाव किसी से याचना करने का नहीं। फिर मठ किस प्रकार बनेगा? अब स्वयं प्रेरित होकर कुछ शिष्यों ने बिना कहे उस मठ का जीर्णोद्धार करा दिया है।

उसी बीच बाबा जी का आदेश हुआ कि श्री श्री विशुद्धेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करो। उनके आदेशानुसार काशी से ता० ७ जून को पञ्चसूत्री नर्मदेश्वर शिव को लेकर निपाणी रवाना हुआ। वहाँ जाकर देखता हूँ कि अभी मठ का काम बाकी था। क्या करूँ? छुट्टी के अन्दर यह कार्य होगा या नहीं, शंका होने लगी। सब लोग कहने लगे, अभी काम बहुत है। यह सब एक महीने में होगा या नहीं, कह नहीं सकते। रात्रि में बाबा जी का आदेश हुआ 'तुम चिन्ता क्यों करते हो, सब कुछ हम करा लेंगे।' उनकी असाधारण कृपा के कारण ५ जुलाई को शहर के लोगों ने उत्सव के साथ श्री विशुद्धेश्वर के मठ में प्रवेश किया। सब कार्य सम्पन्न हुआ। उस दिन सहस्र कुम्भाभिषेक हुआ। सब लोग प्रसाद पाये। उस दिन से नित्यार्चना होती है और मठ का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी बाबा जी अपनी

अलौकिक शक्ति से अलौकिक शरीर में अपने मण्डल में हैं। उनका लक्ष्य महान् है—समस्त जीवों का उद्धार करना है। आज भी कई लोग उनका दर्शन पाते हैं। उनके आदेश के अनुसार साधन में प्रगति होती है। वे बड़े दयालु हैं। प्रेम एवं महाशक्ति दोनों का मिलन कर जगत् के कष्ट को दूर करने के लिये निरन्तर प्रयास में हैं। किसी एक सम्प्रदाय के व्यक्ति नहीं हैं। समस्तप्राणियों के हित के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी कृपा आज भी अन्तर्मुख साधकों पर होती है। महाशक्ति एवं प्रेम को मिलाकर जगत् में अमरस्वरूप प्रगट करना ही उनका उद्देश्य है। उनकी लीला अनन्त है। शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ उनकी कृपा आज भी विद्यमान है। उनकी कृपा एवं अनुकम्पा प्रत्येक क्षण में अनुभव करता हूँ। उनके बारे में लिखने का सामर्थ्य मुझमें नहीं है। अतः मैं श्रद्धावनत होकर उनको पुनः पुनः प्रणाम करना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ক্রম বিকাশ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
এম, এ, ডি, লিট্, পদ্মবিভূষণ।

১। শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্য হইতে জানিতে পারা যায় যে মনুষ্য দেহ অতি দুর্লভ। মনুষ্য দেহ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণত্ব লাভ এবং ভগবৎ সত্তার সঙ্গে মিলন অসম্ভব। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে জীব ও জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জীব চুরাশি লক্ষ যোনি ভেদ করিয়া দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়। এই চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে স্থাবর এবং জঙ্গম উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল জীব নিম্নতম অবস্থা হইতে উচ্চতম অবস্থা পর্য্যন্ত প্রকৃতির ক্রম বিকাশের ধারা অনুসারে পর পর প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবই দেহ বিশিষ্ট, তাহাতে চিদ্ অংশ আত্মারূপে এবং অচিদ্ অংশ দেহ-রূপে বিদ্যমান থাকে। ক্রম বিকাশের পথে দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তারূপী আত্মার বিকাশ সংঘটিত হয় এবং ভোক্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভোগায়তন দেহেরও বিকাশ ঘটিয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনে অর্থাৎ উপনিষদে এই বিকাশ অন্নময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষের বিকাশ জানিতে হইবে। প্রতি কোষের মধ্যেই অসংখ্য জটিলতা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। প্রাণের বিকাশ পূর্ণ হইলেও, দেহের বিকাশ পূর্ণ হয় না।

কারণ মনের বিকাশ আবশ্যক। প্রাণময় কোষের বিকাশের ফলে মনের পূর্ব্বাভাস ফুটিয়া উঠে, ইহা সত্য, কিন্তু যথার্থ মনোময় কোষের বিকাশ চুরাশি লক্ষ যোনি ভেদ না হইলে হয় না। মনোময় কোষের বিকাশ যে দেহে ঘটিয়া থাকে তাহারই নাম মনুষ্য দেহ। চুরাশি লক্ষ যোনি ভেদ করিতে করিতে বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট অন্নময় ও প্রাণময় কোষের বিকাশ সিদ্ধ হয়। এই সকল জীবদেহে মনের বিকাশ থাকে না বলিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খোলে না। মনুষ্য দেহ প্রাকৃতিক ক্রম বিকাশের শ্রেষ্ঠ দান।

২। মনুষ্য দেহের গৌরব সকল ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ বলেন—God created man after His own Image, ইহা হইতে বুঝা যায় সাকার ভগবানের আকৃতি মনুষ্যেরই আকৃতির অনুরূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আত্মাকে পুরুষাকার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মনুষ্য দেহে মনোময় কোষের বিকাশ হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মনোময় কোষের সংশ্লিষ্ট ষট্চক্রাদি চক্র ও কেন্দ্র সমূহ মনুষ্য দেহেই বিকশিত হয়। মনোময় কোষ উদ্ভূত হইবার পর ধীরে ধীরে ইহার ক্রমিক বিকাশ ঘটিয়া থাকে। বিবেক ও বিচার শক্তি পশু হইতে মনুষ্যকে উৎকর্ষ দান করে। এই শক্তিও মনুষ্য দেহেই উন্মেষ প্রাপ্ত হয়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মনুষ্য দেহের আবির্ভাব হইলেই তাহা যে সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিবে এমন কোন কথা নাই।

৩। প্রথম অবস্থায় মানুষ আকৃতিতে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহার প্রকৃতি পশুরই অনুরূপ থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পাশবিক বৃত্তি মনুষ্য দেহে প্রথম অবস্থায় থাকিয়াই যায়, ক্রমশঃ এ সকল বৃত্তি ক্ষয় হইতে হইতে প্রকৃত মনুষ্য ভাবের উদয় হয়। পাশবিক অবস্থায় মনুষ্য জীবনে নৈতিক আদর্শের মূল্য থাকে না। যদিও নৈতিক উৎকর্ষের বীজ মনুষ্যদেহে নিহিত আছে তথাপি উহার বিকাশ কাল এবং সাধনার অধীন। এইজন্য প্রথম অবস্থায় মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হইল নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ লাভ। যোগশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি যম নৈতিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। ইহা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রমের পক্ষে অধিকার অনুসারে ইহাদের পালন আবশ্যক। ধর্ম্ম জীবনের ভিত্তি স্থাপন এই নৈতিক উন্নতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধগণ শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা এই তিন ভাগে সাধন জীবনকে বিভাগ করিয়াছেন। পঞ্চশীল অথবা দশশীলের অভ্যাস সাধন জীবনের মূল স্তম্ভ স্বরূপ। ইহাতে দেশগত অথবা কালগত কোন বন্ধন স্বীকৃত হয় না। ইহাই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম।

৪। প্রতি বর্ণ ও প্রতি আশ্রমেরই ইহা অন্তরঙ্গ সাধন। এই অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা যোগ্য অধিকারীর পক্ষে গৃহীত হইয়াছে। গীতা এই নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতিপাদক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নিষ্কাম কর্ম্মে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত কল্যাণ সিদ্ধ হয়, অপর দিকে তেমনি সামাজিক কল্যাণও পুষ্টিলাভ করে।

ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধন কাটিয়া যায় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় আত্মা এবং পর এই উভয়ের নিগূঢ় ভেদ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায় এবং কর্ত্তৃত্ব অভিমান ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে। যে সকল গ্রন্থি দ্বারা জীব আবদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে অহঙ্কার গ্রন্থিই প্রধান। প্রকৃতির গুণ হইতে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। কিন্তু কর্ত্তা অহঙ্কার-বিমূঢ় থাকে বলিয়া ভ্রম বশতঃ মনে করে যে যাবতীয় ক্রিয়া তাহারি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। মনুষ্যের ক্রিয়া অভিমানের অধীন বলিয়া যতদিন অভিমান নিবৃত্তি না হয় ততদিন মনুষ্য নিজকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হয়।

৫। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালেও সাধকের কর্ত্তৃত্ব অভিমান থাকে তাই সে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মীর ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং ইহার গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া যায়। যখন অল্প মাত্রায় অভিমান থাকে তখন শ্রীভগবনে কৃপাপূর্ব্বক সাধক জীবকে আশ্বাস প্রদান করেন। তাহার ফলে জীব যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরত হয় এবং শ্রীভগবানের নির্দ্দেশ অনুসারে একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকে। ভগবৎ আদেশের তাৎপর্য্য এই যে জীব অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া একমাত্র তাঁহাকেই সর্ব্বমূল বলিয় বিশ্বাস করিতে পারিলে এবং তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে তিনিই জীবকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি দান করেন।

৬। শ্রীভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে জীবকে চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম কাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। তিনি স্বয়ংই জীবকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি দান করেন। ইহাকেই "একায়ন" মার্গ বলে। তখন ভগবান জীবের যাবতীয় যোগক্ষেম বহন করেন। জীব সাক্ষিরূপে বা দ্রষ্টারূপে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার যাবতীয় লীলা দর্শন করিতে থাকে। এই সময়ে জীব হয় দ্রষ্টা আর ভগবান হন কর্ত্তা। এই অবস্থায় জীবের পৃথক্ স্বকীয় কর্ত্তব্য কিছু থাকে না, কারণ ভগবান স্বয়ংই অনুগত জীবের সকল প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন অথবা "spiritual life"—ইহা নৈতিক জীবন অথবা moral life হইতে অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই পরিস্থিতিতে ভগবানের ক্রিয়াশক্তি সাধকের মধ্যে অগাধ ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কৃপাশক্তি সাক্ষাৎ ভগবৎ শক্তি। উহা জীবকে শোধিত করিয়া আপন করিয়া লয়। এই অবস্থায় জীবের যাবতীয় মলিনতা দূর হইয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ খুলিয়া যায়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে জীবের দেহ, মন, প্রাণ এমন কি বুদ্ধিও সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া চিন্ময় শক্তির পূর্ব্বাভাস রূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তখন জীব-স্বরূপের আমুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়, শুধু দেহ বা ইন্দ্রিয়ের দিক দিয়া নহে, তাহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারও তখন চিন্ময়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে জীবের দেহ হইতে অহং সত্তা পর্য্যন্ত যাবতীয় উপকরণ অচিৎ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া চিন্ময় ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার পর চিন্ময় আকার সম্পন্ন জীব, জীবরূপে পরিগণিত হয় না। এই

অবস্থা লাভের পর জীবের প্রাকৃত শরীর দিব্য শরীর রূপে পরিণাম লাভ করে। এই পরিস্থিতি জীবের অমৃতত্ব লাভের পূর্ব্বাভাস। কুণ্ডলিনীরূপা তন্দ্রাচ্ছন্ন চিৎশক্তি তন্দ্রা হইতে মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী রূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করে। এই অবস্থায় জীবের ও তাহার দেহের integration পূর্ণ হয়।

৬। নৈতিক জীবনের পর আধ্যাত্মিক জীবনের ইহাই রহস্য। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হইলে এবং ভগবৎ অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকিলে দিব্যজীবনের সূত্রপাত হয়। এই অবস্থায় প্রকৃতির ক্রিয়া থাকে না, মায়ার প্রভাবও থাকে না। এক চিন্ময় লোকোত্তর দিব্য সত্তাই মাত্র উপস্থিত থাকে।

৭। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সর্ব্ব প্রধান অন্তরায় কর্ত্তৃত্ব অভিমান। এই অভিমান বিগলিত হইবার পর কুণ্ডলিনীরূপা মহাশক্তি অনাদি সুষুপ্তি হইতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া সহস্রারের দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে অমৃত বিন্দু বিগলিত করিয়া নিজের দৈহিক ও মানসিক উপাদানকে বিশুদ্ধ করে। ইহার পরিণতি পরা ভাগবতী শক্তির উন্মেষ। অধ্যাত্ম জীবনের এই তিনটি মুখ্য ক্রম সাধু মাত্রেরই নিত্য স্মরণীয়। এইভাবে ক্রমশঃ নৈতিক জীবন হইতে অধ্যাত্ম জীবনে, এবং অধ্যাত্ম জীবন হইতে দিব্যজীবনে পরিণতি লাভ হয়। বলা বাহুল্য নৈতিক জীবন হইতে অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ এবং অধ্যাত্ম জীবন হইতে

দিব্যজীবনের শ্রেষ্ঠতা স্বভাবতই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। নৈতিক জীবনে কর্ত্তা জীব নিজকে কর্ত্তারূপেই অভিমান করে। কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনে অহংকার নির্ম্মূল হইবার দরুণ দেহাভিমান স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে না এবং তাহার ফলে চিদ্ অভিমান জাগিয়া উঠে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় অধ্যাত্ম জীবন হইতেও দিব্যজীবনে রূপান্তর লাভ হয়। দিব্যজীবনের পরিণতি পূর্ণ অহংভাবের সম্যক্ বিকাশ।

৮। চুরাশি লক্ষ যোনিতে অহংভাবের বিকাশের উপযোগে উপাদান সংগ্রহ অতি সূক্ষ্মভাবে একটু একটু করিয়া হইতেছিল। তাহার পর মনোময় কোষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য দেহ প্রাপ্তির ফলে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভের সূচনা প্রাপ্তি ঘটে। ইহার পর অধ্যাত্ম জীবনে রূপান্তরের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজীবনের আরম্ভ হয়। দিব্যজীবনের পূর্ণ পরিণতি "সোহং" ভাব বা "পূর্ণাহং" বোধ! ইহার পর আর অবস্থান্তর সম্ভব নহে। ইহাই "সাকাষ্ঠা স পরাগতিঃ।" মনোময় কোষের পর বিজ্ঞানময় কোষের বিকাশ সময়ে অধ্যাত্ম জীবন এবং আনন্দময় কোষের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজীবনের প্রারম্ভ জানিতে হইবে।

নমো হরিহর বাণলিঙ্গ মনোহর*

শ্রীকল্যাণী নাথ রায়

নমো হরিহর বাণলিঙ্গ মনোহর
অচিন্ত্য যুগান্ত ভরি শান্ত স্নিগ্ধ কলেবর।
কত শত মুনিজন চরণে দিয়েছে অর্ঘ্য মালা,
যুগ যুগ ধরি কত ভকত নিবেদিত প্রীতি ঢালা,
কত না বন্দনা গীত হয়েছে হিম শৈল পরে,
অফুরান আঁখিবারি চরণে পড়েছে তব ঝরে।
যুগ-যুগান্তের শত স্মৃতি বিজড়িত হিম শৈলতল
কেমনে ফেলিয়া এলে বরি নিলে বঙ্গ ছায়াঞ্চল ?
বঙ্গের মানসীরূপা অর্পিয়াছে বুঝি তব পদে
যুগ-যুগান্তের লক্ষ ভক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য একক সম্পদে ?
তাই তব চিরাগত অচল আসন হল বিচলিত
গ্রহণ করিতে ভক্তশ্রেষ্ঠ মানস কোকনদ কম্প বিরহিত
ছাড়ি শৈলাসন অবহেলে এলে চলে বঙ্গের শ্যামল অঞ্চলে
গ্রহণ করিতে ভক্তজন অর্ঘ্য প্রীত পত্রপুষ্প বিল্ব দূর্বাদলে।

---

* পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের অষ্টোত্তর শততম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বণ্ডুলেশ্বর হরিহর বাণলিঙ্গের উদ্দেশ্যে রচিত।

বঙ্গ জননীর শ্যামতনু স্নিগ্ধোজ্জ্বল অপূর্ব্ব তাপস
ভক্তিতে বেঁধেছে তব শৈলতনু ভক্তিস্নিগ্ধ হিম মানস।
'হরিহর' নাম ত্যজি তাই বুঝি হলে 'ভোলানাথেশ্বর'
যুগ-যুগান্তর অবিচল কীর্তি তব রবে পৃথ্বী পর।
ছাড়ি এবে মরতনু ভক্ত তব চিরসঙ্গ ছাড়িতে না পারি
নরদেহে উত্তরাস্যে নব পরিবেশে আসন পেতেছে মুরারি।
নির্ণিমেষে অতন্দ্র আঁখি মেলি আছে চেয়ে শুধু তোমা পানে
নিবারিতে কভু নাহি পারে, মহাকাল নিত্য হার মানে।
ভক্ত ও ভগবান অভেদাত্মা মিলিয়াছে হেথা দুহুঁ বাহু পাশে
'হরিহর' আখ্যা তব সার্থকতা ভরে ধ্বনিছে আকাশে বাতাসে

বর্ত্তমানেও শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্থূলদেহে দর্শন ও মহতী কৃপা লাভ

শ্রীমতী মাধুরী নিয়োগী
(পত্র লেখিকা) হরিণঘাটা, জেলা নদীয়া ।
(১০ই আগষ্ট ১৯৬৭)

আমি মৈমনসিংহ জেলায় মুক্তাগাছায় ছিলাম। বাড়ীতে বাবা (শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত) ও মায়ের কাছে গেলে তাঁহার (শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের) কথা খুব শুনিতাম। তাঁহাকে দেখার ইচ্ছা খুব হইত। কিন্তু তখন আমি ৺কাশী যাইতে পারি নাই।

বাংলা ১৩৪৩ সনে আষাঢ় কি শ্রাবণ মাসে কলিকাতা আশ্রমে তাঁহাকে দেখি। অল্প কিছু কথাবার্ত্তাও বলিয়াছি। সেই আমি প্রথম দেহে দেখি ও সেই শেষ দেখা।

বাংলা ১৩৬৪ সনে পূজার সময় ৺কাশীতে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার আশ্রমে মহাষ্টমীতে শ্রীশ্রীগুরুদেবী দিদিমার নিকট হইতে আমি দীক্ষা নিয়াছি। শ্রীশ্রীগুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের নিকট হইতে দীক্ষা নেবার সুযোগ সৌভাগ্য আমার তখন হয় নাই।

ইংরাজী ১৯৬২ সনে পৌষ মাসে পুরুলিয়াতে (তারিখ আমার মনে নাই) শেষ রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া আছি, সেই সময় ঘরে বেশ ফুলের গন্ধ পাইলাম, ভাবিলাম বাহিরে

ফুলগাছ হইতে জানালা দিয়া গন্ধ আসিতেছে। তারপর দেখি ঘরে হঠাৎ যেন আলো জ্বলিয়া উঠিল। ওখানে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো ছিল না। ভাবিলাম কে হঠাৎ আলো জ্বালিল। ঘরে বিছানায় যারা ছিল সকলেই ঘুমে অচেতন। চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম, দেখি ঘরের একদিকে জানালার কাছে তিনি (শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব) দাঁড়াইয়া আছেন। দরজা সব বন্ধ। আমার দি:ক তাকাইয়া করুণাময় মিষ্টি মিষ্টি হাসিতেছেন, গেরুয়া কষায় পরা সৌম্যমুর্ত্তি (যেরূপ ৺কাশীর আশ্রমে বিজ্ঞান মন্দিরে আছেন)। আমি হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলাম, ঠিক সেই সময়ে তিনি সরিয়া আসিয়া আমার কানের কাছে আমার দীক্ষার মন্ত্র তিনবার বলিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম। দুই কানেই বলিলেন। তারপর মাথা তুলিয়া দেখি আর একটা জানলা দিয়া একটা আলো বাহির হইয়া গেল। আর তাঁহাকে দেখিলাম না। তার আগে বা পরে আমি কিছু দেখি নাই।

তারপর কলিকাতায় আমার বোনের কাছে লিখিলাম "কি হইল আমি কিছুই বুঝিলাম না।" বাবা লিখিলেন, "তিনি তোমার মন্ত্র চৈতন্য করিয়া গেলেন। আমাদের উপর তাঁহার অশেষ কৃপা।" তারপর হইতে যখনি ৺কাশী আশ্রমে যাইবার সুযোগ পাইয়াছি তখনি ৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসন প্রাঙ্গণে বসিয়া নিয়মিত জপ করিয়াছি। জয় গুরু।

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

পরব্রহ্ম তুমি গুরু করুণা নিদান,
চিরশান্ত উজ্জ্বল মুক্ত মহান্।
ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধিবিমৰ্দ্দকং,
প্রেমাবহং চিরসুন্দরং শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥

সন্ন্যাসী গুরুভাইয়ের সঙ্গলাভ ও সৎপ্রসঙ্গ

৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ সন

রায় সাহেব মোহিনীমোহন সান্যাল

কন্‌খলে একটি ছোট মন্দির, যাহা মনে হয় কয়েক মাস আগেই সংস্কার করা হইয়াছে। ঐ মন্দিরে ছোট একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আমি ঐ মন্দিরের বারান্দায় উঠিতেই একজন হিন্দুস্থানী বলিল—"ইস মন্দির মে মৎ যাও। হিঁয়াসে প্রণাম কর, অন্দর মে যানে কো মানা হ্যায়।"

ছোট দরজা খোলা। সাম্‌নে নতজানু হয়ে প্রণাম করিলাম। ভিতরে অর্দ্ধশায়িত বর্ষীয়ান একজন তাপস সন্ন্যাসী। সুন্দর দীর্ঘায়তন সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্ন ও সহাস্য বদন। বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু, জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া শরীর হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে। মস্তকে গুরুভার লম্বা জটাজুট উপরে জড়াইয়া বাঁধা। গৈরিক কষায় কাপড় পরনে, দেখিতেই মনে হয় করুণার সম্যক্ মুর্ত্তি,

বাহুযুগল প্রায় আজানুলম্বিত। তাপস সন্ন্যাসী আমাকে ইঙ্গিতে ভিতরে যাইতে আদেশ করিলেন। সন্নিকটে নতজানু হয়ে প্রণাম করিতেই আধাভাঙ্গা হিন্দীতে বসিতে বলিলেন। খুব সন্নিকটে বসিলাম। মন্দিরময় গোলাপ গন্ধ। সন্ন্যাসীর নিকটেই একটি শিবলিঙ্গ রূপার গৌরীপটে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মা ভাগীরথীর নীল জল ধারা মাটি ভেদ করিয়া উঠিয়া শিবলিঙ্গটিকে স্নান করাইতেছেন। শিবলিঙ্গটি রং বদলাইতেছে, নীল রং সাদা হলো।

মহান তাপস সন্ন্যাসী ঐ আধাভাঙ্গা হিন্দীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রঃ—"আপ্ (আপনি) বেনারস বিশুদ্ধানন্দ আশ্রম সে আয়া হে ?"

উঃ—আমি অর্দ্ধেক ভাঙ্গা হিন্দীতে ও বাংলা মিশাইয়া উত্তর দিলাম "হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কন্‌খল তীর্থ দর্শনামঁ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ আশ্রম সে আয়া।" বাংলায় লিখিতেছি। তাপস মহান্ সন্ন্যাসী হিন্দীতে প্রশ্ন করিতে ছিলেন।

প্রঃ—আপনি শ্রীগুরুজীর কাছ থেকে বহুত বৎসর দীক্ষা নিয়াছেন।

উঃ—হাঁ, প্রায় ২৫।২৬ বৎসর হইল শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের বেনারস আশ্রমে। তাঁহারই আশ্রিত সন্তান আমি।

তাপস সন্ন্যাসী ঐ আধাভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলেন, আপনার গুরুভাই আমি। বহুত বৎসর হয়ে গেল শ্রী শ্রীগুরুজী গৃহস্থাশ্রমে যাবার আগে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

প্রঃ—আমি প্রশ্ন করিলাম, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

উঃ—নেপালে গণ্ডকী নদী তীরে।

প্রঃ—তাপস সন্ন্যাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি গোপীনাথকে চিনেন ?"

উঃ—আমি বলিলাম, কোন্ গোপীনাথ ?

উত্তরে তাপস সন্ন্যাসী বলিলেন, আপনার গুরুভাই গোপীনাথজী।

আমি বলিলাম, তাঁহাকে চিনি, বেনারস আশ্রমে থাকি তাঁহাকে চিনিব না কেন ?

প্রঃ—আপনি নেপালে থাকেন গোপীনাথজীকে চিনেন কি করে ?

উঃ—উত্তরে তাপস সন্ন্যাসী বলিলেন, বহুত বৎসর হো গিয়া এখন গোপীনাথ মহাযোগী, হ্যামেশা হ্যামলোগ দেখি। আমরাও বেনারস শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ গুরুজীর আশ্রমে যাতা হো। শ্রীশ্রীবাবার আশ্রম উল্লেখ করে অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা বলিলেন। অতীব গোপনীয়, প্রকাশে অসমর্থ।

মহাযোগী গোপীনাথ দাদার সূক্ষ্মদেহ ধরিবার শক্তি ইত্যাদি গুহ্যতম কথার উল্লেখ করিয়া, ঐ গুহ্যতম কথার প্রসঙ্গে জ্ঞানগঞ্জের উল্লেখ করতঃ অনেক অতীব গোপনীয় কথা বলিলেন তাহা অবর্ণনীয় (অন্ততঃ আমার সংকীর্ণ জ্ঞানশক্তিতে)— "মহাযোগী গোপীনাথ জ্ঞানগঞ্জ আশ্রমে আসেন শ্রীশ্রীগুরুজীর দর্শনে।"

প্রঃ—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বেনারস আশ্রম গোপীনাথ

দাদা চালাচ্ছেন। তাঁহার অভাবে কি হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, "এখন বহুত বৎসর গোপীনাথজী আশ্রম চালাবেন। তারপর শ্রীশ্রীগুরুজী ব্যবস্থা করিবেন।

"ক্রিয়া" সম্বন্ধে বহু নিগূঢ় উপদেশ পাইলাম। ইচ্ছা, কৃত্য (ক্রিয়া শ্রীগুরূপদিষ্ট) জ্ঞানশক্তি একত্রে "যোগ," ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞানশক্তি ত্রয়ের যোগ বুঝাইয়া সমবাহু ত্রিকোণের বিন্দুর উল্লেখ করতঃ মধ্যস্থিত বিন্দু ভেদ করিলেই রূপ প্রকটিত হইবে। আরও যোগ বিভূতির উপদেশ দিয়াছেন। উহা অতীব গুহ্যতম তত্ত্ব—সাধন তত্ত্বের উচ্চ সোপানের জ্ঞানশক্তি অর্জ্জন না করিতে পারিলে, চিত্ত স্থির না হইলে, উহা হৃদয়াঙ্গম করা বড়ই সুকঠিন। যতটা সম্ভব আভাসে বর্ণনা করিলাম।

বেলা প্রায় ১০ টার সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের ভোগ দিবার সময় আগত প্রায় জন্য বিদায় চাহিলে অঙ্গুলি দিয়ে দুই চোখের ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিলেন ও মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার শরীরে জোড় তাড়িত বেগ প্রবাহিত হইল, প্রায় পাঁচ মিনিট কাল আমি হতভম্ব হইয়াছিলাম। বিদায়ের প্রাক্কালে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে দ্রুত "ক্রিয়াশক্তি" বাড়াইয়া "পরম লক্ষ্যে" পৌছাতে পুনঃ উপদেশ দিলেন। আশ্রমে শৃঙ্খলা মধ্যে যথাযথ ভাবে বাস করিতে বলিলেন। "সময়ে আবার দেখা হবে" বলিলেন। প্রাণের আবেগে ও আকর্ষণে পরের দিন সকালে পুনরায় কন্‌খলে দর্শন করিতে গিয়া দেখি শিবলিঙ্গ সহ তিনি অন্তর্ধান হয়েছেন।

মহানিশা অমাবস্যা তিথি ৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসন ২৪শে আষাঢ়

সন ১৩৭১ সাল। আমি মহানিশায় ৺নবমুণ্ডী মার সিদ্ধাসনে বেদীমূলে জপ শেষ করিয়াছি। রাত্রি ২ টার সময় মন্দির মধ্যে উপরি বর্ণিত মহাতাপস গুরুভাই সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ করি। তাঁহার পূর্ণ আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি।

৺নবমুণ্ডী মার সিদ্ধাসনে মহানিশায় প্রায়ই মহাপুরুষদের দর্শন লাভ হইতেছে ও অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছে। তাহার বর্ণনা সময় সাপেক্ষ।

হে গুরো পরম গুরু,
সন্তান বাঞ্ছিত কমল অঙ্কিত
পাদপদ্ম মনোহর।
চরণ লিখিত পরাণ মোহিত
সঁপি পদে নিরন্তর
শিষ্য সন্তান বাঞ্ছিত ধন নিজ কর্ম্ম ভেদি
কিরূপে বুঝিব তব লীলা অনন্ত অনাদি।
ভুবন মোহন সে তব গঠন,
ভাষার অতীত ধন।
৺নবমুণ্ডী সিদ্ধাসনে
অলৌকিক দর্শন—
মহানিশা অমাবস্যা তিথি
২৪শে আষাঢ় ১৩৭১ সন
রাত্রি ১২-৩০টা।
ভকত বৈরি নাশি শাণিত কৃপাণ,
হাতে নরমুণ্ড মালী।

দেখা দিলে সন্তানেরে শ্রীগুরু কৃপাবলে,
মহাকালী রূপে।
কিবা উলঙ্গ মূরতি শোভে পদতলে মহাকাল
জাগ্রত জগৎ মাতা করে করবাল
রসনা বদনে ভরি কভু মা করালী
উঠিছ ডুবিছ মাতা দিয়ে করতালি
সে মধু রূপের অপরূপ শোভা
কেমনে বর্ণিব হায়।
বিশ্বজননী শক্তিরূপিণী—
জগতে প্রকাশ পায়।
তব মহাজ্যোতির ঝলকে মাগো
আঁখি হলো ধূম্রময়।
হেন কালে দেখি মাগো তব নাভি হতে
হইল উদয়
অপরূপ রূপধারী ভুবন মোহিনী
মুকতি দায়িনী শক্তি কালী কুণ্ডলিনী
দেখি মাগো পদতলে শিব শব শয়ান
পরমাত্মা মুক্তিদাতা প্রফুল্ল বয়ান।

চরণাশ্রিত অধম সন্তান—
মোহিনীমোহন সান্যাল
শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম।

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দায়ন বাল্যখণ্ড

(শ্রীশ্রীগুরুদেবের অবতরণ)

শ্রীমতী অনুপমা দেবী
১০, সাহাপুর মেন রোড, কলিকাতা-৮

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৭০ সাল।

খ্যাতিমান বর্দ্ধমান তথি বণ্ডুল গ্রাম
ধন্য ধন্য সেই গ্রামখানি।
বারশো বত্রিশ সাল উনত্রিশ ফাল্গুন ধন্য
চট্টোপাধ্যায় বংশ ধন্য মানি॥
মহাশূন্য হতে আজ পরিয়া নূতন সাজ
পরম পুরুষ লীলা সুখে।
আর্ত্তে তারিবে বলে নেমে এলো অবহেলে
ব্যথাতুরা ধরণীর বুকে॥
সেই মহাশুভক্ষণে সেই মহাপুণ্য দিনে
হর্ষে পূর্ণ দশদিক হেন।
পলাশ ফাগেতে রাঙ্গা অঞ্চল বিছায়ে দেছে
আনন্দিতা মা ধরণী যেন॥
আম্র শাখায় ফুল্ল নব মুকুলের দল
শাখে শাখে সবুজ কেবল।
কলরোলে শুকসারী কার আগমনী গায়
কোন সুখে প্রকৃতি উতোল॥

ভ্রমর ভ্রমরী ওই গায় আবাহনী গান
কোকিলেরা ধরে কুহু তান।
ময়ূর ময়ূরী নাচে আনন্দে পেখম মেলি
হরিণেরা ছোটে খুসি প্রাণ॥

ফুলে ভরা কুঞ্জবন, শোভা মন বিমোহন,
সে সুগন্ধ মন্দ সমীরণ।
ছড়ায় সকল দিকে, গ্রামখানি ভরা সুখে,
কেন আজ এতো আয়োজন॥
আজ বুঝি ভগবান, নররূপে জন্ম লন,
তাই বিশুদ্ধ আনন্দময় ধরা।
আজ গন্ধের রাজা আসে, চৌদিক আনন্দে ভাসে,
বিশুদ্ধ সুগন্ধে দিক্ ভরা॥
যুগে যুগে জগতের, ক্রন্দনে আর্ত্তের,
বার বার এসেছো যেমন।
পাপী তাপী জীব দলে, ভালবেসে অবহেলে,
যত দুঃখ করেছো বরণ॥
হেরি মহাপুণ্যাধার, পুত্রত্ব নিলে স্বীকার,
অখিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।
তস্য পত্নী মহাদেবী, রাজরাজেশ্বরী গর্ভে,
জন্ম নিলে শিশুরূপে ফের॥
দশ মাস হলো পূর্ণ, ভূমিষ্ঠ হইল শিশু,
দিক্‌মণ্ডল উঠিলো গো হেসে।

বুঝি পূর্ণিমার চাঁদ খসি, ধূলায় লোটায় রে,
কে কোথায় আছ দেখ এসে ॥

অপরূপ সে মাধুরী, পরিজন নেত্রে হেরি,
মুগ্ধ সবে আনন্দে মগন।
ধন্য ধন্য এর পিতা, আরো শত ধন্য মাতা,
মোরা ধন্য পেয়ে এ রতন ॥
হুলাহুলি দেয় আসি, করতালি দিয়া নাচি,
শঙ্খধ্বনি করে রমণীরা।
বুঝি দেবগণ সিদ্ধগণ, জয়ধ্বনি সবে দেন,
মহানন্দে অলক্ষ্যে থাকিয়া ॥
জননী পরম সুখে, ছেলে তুলে লন বুকে,
কে জানে ও মহাযোগিরাজ।
নররূপী শিব যে গো, কত মর্ত্ত্য মানবের,
মৃত্যু রোধিবারে এল আজ ॥
গুরুরূপে এলে আজ, হে জগদ্‌গুরু ওগো,
কত যে মাধুরী ভরা অঙ্গে।
গণকেরা খড়ি পাতি, কত যে গণিল পাঁতি,
ভোলানাথ নাম দিল রঙ্গে ॥
অখিল চাটুর্য্যে ঘরে, আনন্দ উছলি পড়ে,
গৃহে তাঁর নাহি অনটন।
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া কর্ম্ম, সুখে চলে গৃহধর্ম্ম,
পল্লীর গৃহস্থ ঘরে ধান মহাধন ॥

জাত কর্ম্ম সমাপন, পরে অন্নপ্রাশন,
শিশু বাড়ে চন্দ্রকলা মত।
আধো আধো মা, মা বুলি, তুড়বুড়ি হামাগুড়ি,
রঙ্গ কথা কহিব গো কত॥
ছ'মাস গত বয়সে, পিতৃহীন হোলো শিশু,
শিশুটিরে মাতা বুকে ধরি।
পালিলেন সযতনে, পেয়েছেন যে রতনে,
পতি শোক হৃদে রুদ্ধ করি॥
সময় আসিলে হোলো, হাতে খড়ি বিদ্যারম্ভ,
বাল্যলীলা শুন তবে যত।

ধুলি দিয়া শিব গড়ি, বনফুলে পূজা তাঁরি,
এই খেলা হইত সতত॥
একদিন সেই মত, শিব গড়ি মনোমত,
বিল্ব পত্রে হইতেছে পূজা।
এক সে খেলার সাথী, বিঘ্ন করে শিব ভাঙ্গি,
মনে ভাবে করিলাম মজা॥
ভাঙ্গিল ভোলার ধ্যান, হেরি ক্রোধে কম্পমান,
বলেন বালকটিকে শোন।
আমার শিবের সনে, করিলি কোন্দল জেনে,
ওঁর সাপ তোরে আজ করিবে দংশন॥
যথার্থই সেইদিন, সাপে কাটে ছেলেটিকে,
পিতা তার ভোলা কাছে আসি।

সকাতরে কহে বাছা, রক্ষা কর পুত্রে মোর,
ক্ষম তার সব দোষ রাশি ॥

শিবের স্নানের জল, লয়ে ভোলা ছুটে যায়,
সেই জল দেয় তার মুখে ।
ভোলানাথ কর স্পর্শে, বিষ জ্বালা হোলো শান্ত,
আসন্ন মরণে পেল রক্ষে ॥

বাল্য হতে সত্যাশ্রয়ী, নির্ভীক অধ্যবসায়ী,
হেরি পরিজনে স্তম্ভিত ।
তাঁর অলৌকিক কর্ম্ম হেরি, কাকা কাকী বন্ধুগণ,
শ্রদ্ধাভরে হইত বিস্মিত ॥

লক্ষণজ্ঞ ছিল যাঁরা শিশু হেরি কহে তাঁরা,
এ শিশু তো নহে গো সামান্য ।
প্রসন্ন সে পদ্ম আঁখি, অঙ্গে অন্য চিহ্ন দেখি,
কহে পরম পুরুষ এই গণ্য ॥

সেদিন নূতন বস্ত্র, আনমনে ছেঁড়ে ভোলা,
খুড়া আসি ভৎসিলেন তাকে ।
মুঠি করি বস্ত্রখানি, ছুঁড়িয়া ফেলিল ভোলা,
জুড়ে গেছে তুলে সবে দেখে ॥

মানিল আশ্চর্য্য সবে কি জানি এ কেবা হবে,
পরিজন তাঁরে করে মান্য ।
কাকা কাকী সদা তাঁরে, সম্ভ্রমেতে সমাদরে,
তাঁর বাক্যে বেদবাক্য গণ্য ॥

সেই কর্ম্মে বড় প্রিয়, গ্রামের শ্মশান ক্ষেত্রে,
নির্জ্জনেতে বটবৃক্ষ তলে।
ব্যাকুল হৃদয়ে গিয়া, রহিতেন একা বসি,
সেই ঘোর জনহীন স্থলে ॥
শিব মন্দিরে আর, সিদ্ধেশ্বরী কালী গৃহে,
সময় কাটিত কত তাঁর।
বয়োবৃদ্ধগণে কহে, দেব অংশ এসেছেন,
পুরাইতে কোনো কার্য্য ভার ॥
খ্যাপা খুড়ো বলি তাঁরে, কাকা কাকী ডাকিতেন,
প্রশ্ন করিতেন ভবিষ্যত।

সে বালক যা বলিত, সেই কথা ঠিক হোতো,
তাঁরা জানি মহাপুলকিত ॥
ছ'মাস বয়স যবে, পিতৃহীন শিশু তরে,
পিতৃস্নেহে পালিলেন খুড়া।
অষ্টম বরষ গত, সেই খুড়া স্বর্গগত,
কাঁদিয়া আকুল গৃহ পাড়া।
বালকের চোখে কিন্তু, জল নেই এক বিন্দু,
আশ্চর্য্য হইল সবে দেখি
সবে কহে বুঝিলাম, মায়ার প্রভাব কম,
বালক মায়ারে দিবে ফাঁকি ॥
বালক বয়স বাড়ে, কাপড় পরায়ে দিলে,
খুলিয়া কাহারে দিত দান।

করিলে তিরস্কার, কহে উলঙ্গই ভালো,
কি জন্য এ বৃথা আবরণ ॥
এ সব ঘটনাগুলি, অতি ক্ষুদ্র হইলেও,
উপেক্ষার বস্তু ইহা নয় ।
মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব যে, দীর্ঘ সাধনার ফল,
তীব্র অধ্যবসায়েরি পরিণাম হয় ॥
বয়স যবে নবম, হইল উপনয়ন,
সাবিত্রী সাধনে হলো রত ।
সাবিত্রীর প্রভাবেতে, স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য,
শতগুণ হইল বর্দ্ধিত ॥
বাল্যলীলা যত তাঁর, তাহা হতে যৎকিঞ্চিৎ,
অক্ষরেতে লেখনী রাখিল ।
অধম অক্ষম তবু, লিখি যাঁর দয়া গুণে,
তাঁর দয়া হোলে পুনঃ আরো লিখিব সকল ॥

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পিতা, ধন্য ধন্য অখিলচন্দ্র,
সগৌরবে ও চরণে নমি বারবার ।
রাজরাজেশ্বরী সমা মাতা রাজরাজেশ্বরী,
চরণেতে নমি শতবার ॥
গোপীনাথ কবিরাজ, প্রমাণ যা রেখেছেন,
তাহা হতে বর্ণিনু কিঞ্চিৎ ।
স্বামিজীর অতি প্রিয়, জ্যেষ্ঠ তিনি আমাদেরে',
মোর চেষ্টা মাত্র আমি অকিঞ্চিৎ ॥

আমার বর্ণনে যাহা, দোষ দুষ্ট হলো ওগো,
ভোলানাথ দয়াময় ক্ষমিবেন জানি।
পড়িবে যে সুধীজন, এ বিশুদ্ধানন্দায়ন,
পাইবে সে অমৃতের খনি ॥

হে বিশুদ্ধানন্দ দেব, অহৈতুকী কৃপা তব,
পাইয়াছি কত ভাগ্যবলে।
হে দয়াল জানি জানি, রেখেছ রাখিবে টানি,
শান্তিময় ঐ পদতলে ॥

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ স্মরণে

শ্রীঅমরনাথ গোস্বামী
(গ্রাম—সরপী, জিলা—বর্দ্ধমান)

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা প্রসঙ্গে কিছু লিখব ভাবলাম। কি লিখব ? তাঁর অসীম বিভূতির কতটুকু আমাদের পক্ষে লেখা সম্ভব ! এ যেন অপার সমুদ্রে কিঞ্চিৎ বারি সিঞ্চনের মতো। সূর্য্যের লালিমা যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনই তাঁহার বিভূতি আমাদের মনের গ্লানি দূর করিয়াছিল। তাই এই সময়ে যদি তাঁহার অলৌকিক শক্তির সামান্যতমও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই তা'হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিব। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আমার মেজ ভগিনীপতি ৺রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী (ইনি উখরা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন) গুস্করা হইতে সঙ্গে লইয়া সরপী গিয়াছিলেন (অনুমানতঃ সন ১৩১২ - '১৩ সালে । শ্রীশ্রীবাবা উখরা ষ্টেশন হইতে আমার ভগিনীপতির আগে আগে যাইতেছিলেন অথচ তিনি কখনও পূর্ব্বে উখরা ষ্টেশন হইতে সরপীর রাস্তা দেখেন নাই। প্রায় তিন মাইল রাস্তা মাঠে মাঠে বরাবর আগে আগে যাইয়া একেবারেই আবার ভগিনীপতির বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আমি তখন ভগিনীপতির

বাড়ীতে পড়িতাম ও রাত্রেও থাকিতাম। সকালে উঠিয়া দেখি এক দিব্যাঙ্গ সুপুরুষ খাটিয়ায় বসিয়া আছেন, পরনে সুতার ধুতি এবং গায়ে দামী জামা। সেই আমার তাঁহাকে প্রথম দেখা। সেই সময়ে আমাদের গ্রামের পঞ্চানন রায়চৌধুরীও আমার ভগিনীপতির বাড়ীতে পড়িত। সেই বৎসরে সে এণ্ট্রান্স ফেল করিয়াছিল। আমার এখনও বাবার বাণী সুস্পষ্ট মনে আছে। এই প্রসঙ্গে বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে গিরীন্দ্রকে (Supdt. of Police) বলিয়া এবারে Sub-inspector এ বহাল করিয়া দিব। কিন্তু তখন সে পুলিশে চাকরী করিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সেই পুলিশ লাইনেই head constable পদে চাকুরী করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখন সে আপশোষ করিয়া বলিত "প্রথমেই বাবার কথা না শুনিয়া মহা অন্যায় করিয়াছি।" পরবর্ত্তীকালে সে বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। বাবা সরপী জ্যৈষ্ঠ মাসে গিয়াছিলেন। সূর্য্যের প্রখর তেজ ও অসহনীয় গরমের জন্য আমার ভগিনীপতি বলিয়াছিলেন, "বাবা বরফ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে, বরফ আনিলে যৎকিঞ্চিৎ কষ্ট প্রশমিত হইত।" তখন বাবা বলিলেন, "ভুল হইয়াছে তাহাতে কি হইবে? বড় গ্লাসে এক গ্লাস জল আন।" তাঁর আদেশ মত জল আনা হইল। বাবা গ্লাসের উপরে হাত দ্বারা প্রায় এক মিনিট ঢাকা দিয়া রাখিলেন। তৎপরে বলিলেন, "এই নাও, বরফ নাও।" আমরা সকলে বিস্ময়াভিভূত হইয়া দেখিলাম যে জল তখন বরফে রূপান্তরিত হইয়াছে ও এক গ্লাস জলের পরিবর্ত্তে তখন তাহা

এক গ্লাস বরফে পূর্ণ। সেই সময়ে তাঁহার গাত্রে মাছি, মশা বা অন্য কোনও জীব বসা মাত্র তাহা মরিয়া যাইত।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ

আমি ১৩১৯ সনের ১৩ই আষাঢ় দীক্ষা গ্রহণ করি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রী৺তুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আমি এবং আমাদের গ্রামের বহু শিষ্য তাঁহার বিভূতি দেখিয়াছিলাম। তিনি ১৩৩৩ সনে জ্যৈষ্ঠ মাসেই আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের পরেই সকাল বেলায় আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন ওখানে তু'মাইলের মধ্যে কোনও অনাদি লিঙ্গ শিব আছে নাকি এবং নিকটে কোনও পুকুরে পদ্মফুল আছে নাকি। আমরা বলিলাম, "হ্যাঁ আছে, পাটসাওড়া গ্রামে ভীমেশ্বর নামক অনাদি লিঙ্গ শিব আছে এবং আমাদের গ্রামে রামসায়ের নামক পুষ্করিণীতে পদ্মফুলও আছে।" আমাদিগকে তিনি বলিলেন, "চল পদ্মফুল দিয়া তাঁহার পূজা করিব, তাঁহার আদেশ হইয়াছে।" আমরা অনেকেই তাঁহার সঙ্গে এই পুষ্করিণীতে পদ্মফুল তুলিতে গিয়াছিলাম। সেই পুষ্করিণীর পারে বেলগাছের তলাতে বহুদিন হইতেই এক বাবাজী বাস করিতেন। ভয়ে সেই পুষ্করিণীতে কেহ নামিতে চাইত না। দূরে বহু পদ্মফুল ফুটিয়া ছিল। দাদার হাতে প্রায়ই একটি বাঁশের অনুমানতঃ তু'হাত লম্বা লাঠি থাকিত। দাদা আমার হাতে দিয়া বলিলেন এই লাঠিটি লইয়া ফুল তোল। লাঠি লইয়া ফুল তুলিতে গেলাম। বহুদুর পর্য্যন্ত

যাইয়া প্রচুর ফুল তুলিয়া আনিলাম কিন্তু লাঠি ডুবিল না। সেখানে অনুমান তিন হাত জলের কম হইবে না। আমরা সকলেই সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তারপর সকলেই সে ফুল ও অন্যান্য পূজোপকরণ লইয়া উক্ত পাটসাওড়া ভীমেশ্বর শিবের পূজা করিয়া আসিলেন। আমরা তাঁহাকে অনেক সময় কৌতূহল বশতঃ পরীক্ষা করিয়াছিলাম। দাদা একটু মৌন ভাবে থাকিয়া প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। এই রকম তাঁহার বিভূতি নানা ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তিনি প্রতি বৎসরেই ১৩৩৩ সন হইতে ১৩৪৬ সন পর্য্যন্ত আমাদের কুটীরে পদধূলি দিয়াছিলেন।

আমার এক শিষ্য কুড়ারাম পাঠক গুষ্করা গ্রামের নিকট বাস করিত। সে ধানবাদের নিকট কুস্তোড় কলিয়ারীতে Surveyor এর চাকুরী করিত। সে কঠিন ও দুরারোগ্য হাঁপানীতে ভুগিত। ডাক্তারের বহু চিকিৎসাতেও আরোগ্য লাভ করে নাই। পরে ডাক্তার তাহাকে ছুটি লইয়া সমুদ্র তীরে দু'তিন মাস বাস করিবার পরামর্শ দেয় এবং তাহাতে রোগ অনেক ভাল হইবে বলে। শিষ্য ডাক্তারের পরামর্শ মত গোপালপুর সমুদ্র তীরে যায়। সেখানে প্রায় আড়াই মাস বাস করার পরেও তার রোগ প্রশমিত হয় না ও বাড়ী ফিরিয়া যায়। এই মর্ম্মে সে আমাকে পত্রে লেখে। আমাদের গুরুদেব তখন বর্দ্ধমানে ছিলেন। আমি আমার শিষ্যকে লিখি যে সে যেন বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে।

আমার কথামত শিষ্য বর্দ্ধমানে তাঁহার সহিত সামান্য ফলসহ দেখা করিতে যায়। সে সময়ে আশ্রমের নিয়ম ছিল যে বাবার শিষ্য ব্যতিরেকে কেহ তাঁহার বিনা অনুমতিতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিবে না। সুতরাং শিষ্য তথায় পৌঁছাইলে আমার গুরু-ভাইয়েরা তাহাকে বলেন, "তুমি দাঁড়াও, আমি আগে গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" পরে তিনি বাবাকে বলেন, "এক ভদ্রলোক আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।" তাহাতেই শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "ওরে, ও আমার শিষ্যের শিষ্য, তাহার প্রবেশের অধিকার আছে। তাহাকে আসিতে দাও।" ইতিমধ্যে দাদা (শ্রীশ্রী৺দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়) তাহাকে বলেন, "আপনি ফলসহ যাইবেন না কেননা তিনি শিষ্য ভিন্ন অন্য কাহারও জিনিষ গ্রহণ করেন না। আমাকে তাঁহার অনুমতি লইতে দিন।" শ্রীশ্রীবাবাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "শিষ্যের শিষ্য এনেছে, তার ফল নিতে কোনও বাধা নাই।" শিষ্য তখন মহানন্দে শ্রীশ্রীবাবার সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে তার রোগের অসহনীয় কষ্টের কথা উল্লেখ করেন এবং ইহা হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "তুমি নির্ভয়ে বাড়ী যাও। এই মর্ম্মে আমি আমার শিষ্য অমরকে কিছু নির্দ্দেশ দিব এবং তার কথা মত তুমি যদি কর্ম্ম করিতে পার তাহা হইলে এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিবে। তুমি বাড়ীতে গিয়া আমার শিষ্য অমরনাথকে আমার সহিত দেখা করিতে বল।" শিষ্য তাঁহার কথানুযায়ী আমায় লেখে। আমি তখন শ্রীশ্রীবাবাকে

বর্দ্ধমানে গিয়া দর্শন করি। তিনি আমায় সামান্য যৌগিক ক্রিয়া দেখান এবং নির্দ্দেশ দেন, "তুমি তোমার শিষ্যের ওখানে গিয়া এই যৌগিক ক্রিয়া করিতে বল। প্রথমে দিনে দু'তিনবার, পরে ধীরে ধীরে বাড়াইতে হইবে। এইরূপ কয়েক মাস করিলেই আরোগ্য লাভ করিবে।" তাঁর নির্দ্দেশানুযায়ী আমি আমার শিষ্যের গৃহে গিয়া যৌগিক ক্রিয়া দেখাই এবং অভ্যাস করিতে বলি। তিন চারদিন থাকিয়া যখন দেখি যে সে যৌগিক ক্রিয়া করিতে পারিতেছে তখন তাহাকে সেইরূপ করিয়া যাইতে বলি এবং আমাকে তাহার অবস্থা পত্রে জানাইতে বলি।

প্রায় সাতদিন পরেই শিষ্য আমায় জানায় যে তার শরীরটা কিছু ভালর দিকে এবং প্রায় এক মাস পরেই জানায় যে সে সম্পুর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহার পরেও সে এই ক্রিয়া করিয়া যায় এবং আজ পর্য্যন্ত তাহার হাঁপানীর প্রকোপ দেখা দেয় নাই। প্রকৃত যোগীর ক্রিয়াতে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, আবার নামধারী যোগীর ক্রিয়াতে রোগ টানিয়া আনে, আমি এক রোগীর পিতার নিকট হইতে শুনিয়াছি।

তখন পরমারাধ্য গুরুদেব কলিকাতায় রূপনারায়ণ নন্দন লেনে বাস করিতেন। সেই সময়ে পুরী হইতে এক ভদ্রলোক সেখানে আসেন। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি

তাঁহার পুত্রের রোগের বিবরণ আমার কাছে বলিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের থাইসিস্ হয়। তার থাইসিস্ অবস্থায়, গুরুদেব যখন পুরীতে যান তখন তাহার সহিত দেখা করেন। সে তখন তার থাইসিস্ রোগের পরিচয় গুরুদেবের কাছে দেয়। তাহাকে গুরুদেব বলেন, "তুমি বোধ হয় অমুক ক্রিয়া করিয়াছ এবং সেই ক্রিয়ার ফলেই এই থাইসিস্ হইয়াছে।" তাহাতে সে উত্তর দেয়, "বাবা, কোনও এক যোগীর নিকট আমি দীক্ষা লই এবং সেই যোগী আমাকে এই ক্রিয়া করিতে আদেশ দেন এবং সেই ক্রিয়া কিছুদিন করার পর আমার এই ব্যাধি দেখা দেয়।" বাবা বলেন, "যাহা হোক্, তুমি অদ্য হইতে এই ক্রিয়া বন্ধ কর এবং আমি যে ক্রিয়া করিতে বলিব তাহা অদ্য হইতে আরম্ভ কর।" বাবার আদেশ মত কিছুদিন ক্রিয়া করার পর তাহার রোগ সারিয়া যায়। আমি রোগীর পিতার নিকট হইতেই ইহা শুনিয়াছি। কাজেই অনভিজ্ঞ লোকের আদেশানুযায়ী ক্রিয়া করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য আর কত বলিব। তার কি শেষ আছে ? একবার আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীবাবার কাছে কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "আমার সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। আপনার করুণায় যেন এবার আমার পুত্র বাঁচিয়া থাকে।" বাবা কৃপা পূর্ব্বক আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "এবার তোমার পুত্র হইবে এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিবে।" পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কৃপায়

সেইরূপই হইয়াছে। এইরূপ বহু অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতি সিদ্ধ যোগীর কাছে এই সব কিছুই আশ্চর্য্যের নহে। শিব সংহিতায় আছে যে "দেহেস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতঃ" ইত্যাদি। সুতরাং মহাযোগীর পক্ষে এই সকল অলৌকিক ব্যাপার কিছুই নহে।

শ্রীশ্রীবাবার চরণে সদা সর্ব্বদা মতি ভক্তি থাকে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীগুরু গৌরব

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, কবিরত্ন

(১)

হে দেব, মহিমা তব অতল অপার,
বোধিসত্ত্ব সম ছিল চিত্তের প্রসার ;—
অসীম প্রজ্ঞার সাথে অসীম করুণা
কে কোথা দেখেছে কবে ইহার তুলনা ?

(২)

প্রজ্ঞার বিলাস এক হ'ত শিষ্যহিতে,
বহু জনমের তার কর্ম্ম পরীক্ষিতে।
সুনির্ণীত শক্তিদীপ্ত মন্ত্র কর্ণে দিয়া
মুহূর্ত্তেই কুণ্ডলিনী দিতে জাগাইয়া।
যোগ ক্রিয়া যাহা দিতে সহজ সরল
আড়ম্বরহীন, কিন্তু ফলে অবিচল।

(৩)

শিশুপাঠ্য পুস্তকের শস্তা উপদেশ
করিতে না বিতরণ ; কপটতা লেশ
ছিল না তোমাতে। দিতে উপদেশ সার
যোগ্যতা ও প্রয়োজন করিয়া বিচার।
সুসংযত বাক্য মন সদা অল্পভাষী,—
ছিলে না তো কভু তুমি প্রচার প্রয়াসী।

(৪)

বিচিত্র বিভূতিরাশি ছিল আত্মগত
শেফালী ফুলের মত ঝরিত নিয়ত।
উহার প্রচ.র ফলে শিষ্য দলে দলে
আসুক, চাওনি তুমি ইহা কোনো কালে।
শিষ্যেরা আসিত নিজ সুকৃতির বলে
স্থূল সূক্ষ্ম সূত্র ধরি' সময় হইলে।
ধনী দরিদ্রেতে ভেদ করিতে না কভু,
সকলে দিয়েছ দীক্ষা অকাতরে, প্রভু।

(৫)

করুণার কথা তব কি বলিব আর—
শিষ্যসনে পিতৃসম ছিল ব্যবহার।
গুরুজন পরীক্ষক, পিতা স্নেহময়,
পিতৃভাবই করেছিলে গুরুভাব নয়।
কত না রোগের ভোগ নিয়েছ টানিয়া
জরাগ্রস্ত শরীরেও আপন ভুলিয়া।
প্রাণই দিলে এইভাবে,—এমনি কোমল
হৃদয় তোমার ছিল করুণা উজ্জ্বল।

(৬)

ছিলে তুমি প্রেমময় পতিত পাবন
তব লীলা চিন্তা করে চিত্তের শোধন।

কাহারও কোনো পাপ অজ্ঞাত তোমার
থাকিত না কভু, তবু ঘৃণা পরিহার
করিয়া বলিতে সবে, "কর্ম্মে দেও মন,
কর্ম্মই হরিতে পারে পাপ অগণন।
কুকার্য্য কুচিন্তা যত সকল ত্যজিয়া
কর্ম্ম কর স্থির চিত্তে আসনে বসিয়া।
আর সব ভার দেও আমার উপরে
গুরুবাক্য মিথ্যা নয়, জানিও অন্তরে।"

(৭)

দৃঢ় অকপট এই তোমার আশ্বাস,
হে পিতঃ, জাগায় যেন নির্ভর বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত

প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১ (অনুপলভ্য)

দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১—১·২৫ পয়সা

তৃতীয় ভাগ—লীলা-কথা

পূর্বার্দ্ধ—১—১·২৫ পয়সা

উত্তরার্দ্ধ—১—২—১৲+১৲ টাকা

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৲ টাকা

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—৩৭ পয়সা

৪। বিশুদ্ধবাণী—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত

প্রথম ভাগ—২৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ—২৲ টাকা

তৃতীয় ভাগ—২৲ টাকা

চতুর্থ ভাগ—১৲ টাকা

পঞ্চম ভাগ—২৲ টাকা

ষষ্ঠ ভাগ—২৲ টাকা

সপ্তম ভাগ—২৲ টাকা

অষ্টম ভাগ—২৲ টাকা

নবম ভাগ—২·৫০ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যকারক—

"বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম"

মালদহিয়া, বারাণসী।